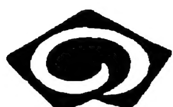
ছন্দের বারান্দা

অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা ৬



প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮

প্রকাশিকা

অরুণা বাগচী

অরুণা প্রকাশনী

৭ যুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক

আর. রায়

সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৫১ ঝামাপুকুর লেন

কলকাতা ৯

সুধীর রায়চৌধুরী

প্রিয়বরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

সৃষ্টি ও নির্মাণ

কবিতার মুহূর্ত

এ আমির আবরণ

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

শব্দ আর সত্য

নিঃশব্দের তর্জনী

নিহিত পাতালছায়া

তুমি তো তেমন গৌরী নও

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

বাবরের প্রার্থনা

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ

শ্রেষ্ঠ কবিতা

সকালবেলার আলো

ভূমিকা

ছন্দ কাকে বলে অথবা ছন্দের বিশ্লেষণ করা যায় কীভাবে, বাংলা ছন্দের কটা ধরন আর কী-বা তাদের পরিচয়—এসব নিয়ে এখনো অনেক লেখা সম্ভব, অনেকে লিখেওছেন তা। কিন্তু এ বইয়ের উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন। কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ছন্দের যোগ কোথায়, কীভাবে কোনো কবি অল্পে অল্পে খুঁজে নেন তাঁর নিজের ছন্দ, অথবা কীভাবে কোনো ছন্দ যেন খুলে যায় এক মুক্তির দিকে, এই নিয়েই ছিল আমার নানা সময়ের ভাবনা।

'মুক্তি' কথাটা অবশ্য একটু গোলমেলে। কিসের থেকে মুক্তি? ছন্দ থেকেই? অর্থাৎ, পদ্য থেকে গদ্যে পৌঁছনো? বাংলা কবিতা কখনো কখনো সেই মুক্তি চেয়েছে ঠিকই। পদ্যছন্দকে কখনো কখনো আমরা ভেবেছি জীবন-মুখিতার পথে মস্ত বাধা। ভেবেছি যে, কবিতাকে সত্যে এবং ব্যাপ্তিতে পৌঁছে দেবার জন্য খুলে দেওয়া চাই এই বাধা, পদ্যছন্দের ঘর থেকে তাকে এনে দেওয়া চাই একেবারে গদ্যছন্দের পথে। ভেবেছি, এরই নাম হলো মুক্তি।

কিন্তু কেবল এটুকুই নয়। হয়তো আরো একরকম প্রচ্ছন্ন মুক্তি সম্ভব। ছন্দ থেকে নয়, ছন্দের মধ্যেই আছে সেই মুক্তি: ঘর আর পথের মাঝখানে যেন এক খোলা বারান্দা আছে কোথাও। কখনো-বা চলে আসা যায় সেই বারান্দায়, ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থেকেই কখনো কখনো ভেঙে দেওয়া যায় তার শুকনো নিয়ম, মিটিয়ে নেওয়া যায় গদ্যপদ্যের পরোক্ষ বিরোধ। এক হিসেবে, আধুনিক ছন্দের ইতিহাস হলো এই বিরোধমীমাংসারই ইতিহাস।

এ-বই অবশ্য তেমন কোনো ইতিহাসও নয়। এখানে কেবল পাওয়া যাবে সেই ইতিহাসের কয়েকটি ছিন্ন মুহূর্ত, মধুসূদন থেকে বিষ্ণু দে পর্যন্ত অল্প কয়েকজন কবির প্রসঙ্গে চিন্তা। মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ বা সুধীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসু। হয়তো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হতে পারত জীবনানন্দ বা অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়েও, সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়েও। এঁদের কথা যে এ-বইতে কেবল প্রসঙ্গতই বলা হয়েছে মাত্র, তার বেশি নয়—সেজন্য দায়ী কেবল আমার আলস্যময় অক্ষমতা।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

সূচীপত্র

প্রথম দরজা

'সুরে বসানো কথাই হলো কবিতা' : এইরকম একবার বলেছিলেন দান্তে। কিন্তু দান্তের পরবর্তী ইওরোপীয় কবিতায় অথবা একশো বছর আগে বাঙলা কবিতায় কবিদের একটা বড়ো সমস্যাই ছিল সুর থেকে কথাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। আধুনিক কবিতা চেয়েছিল যে কথা তার নিজের পায়েই দাঁড়াক।

আমাদের মধ্যযুগের কবিতা এক হিসেবে গান। আধুনিক যুগে পৌঁছে গান আর কবিতা পৃথক হলো বটে, তবু অনেকদিন পর্যন্ত দেখতে পাই : যিনি কবি তিনিই লেখেন গান, তিনিই দেন সুর। যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, আর—এই সেদিনও—যেমন নজরুল। তাই সুরের প্রভাব কবিতাকে ছেড়ে যাবে না, এই ছিল ভয়। গানের আবহ থেকে কবিতাকে একেবারে সরিয়ে এনে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা দেওয়া, নূতন যুগের দায়িত্ব ছিল এটা। এই দায়িত্বেরই প্রথম প্রকাশ ছিল মধুসূদনের রচনায়, তিনিই খুলে দিয়েছিলেন আমাদের ছন্দোমুক্তির প্রথম দরজা। তাঁর হাতে তৈরি ছন্দের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ, সুরের ছন্দ থেকে কবিতাকে তিনি কথার ছন্দের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন কথার মধ্যে এক সুর। এ সুর গানের সুর নয়, ললিত লাবণ্য নয়, এ সুর আছে আমাদের কথা-বলার প্রবহমানতায়, আমাদের স্বরের উত্থানপতনে। তাই ধ্বনি-হিল্লোলময় এক বাক্‌স্পন্দ রচনাই হয়ে উঠল মধুসূদনের ছন্দের লক্ষ্য।

নূতন এই ছন্দে কী ভাবে মধুসূদন কথার থেকে বার করে নিলেন সুর? এই সুর তো আর বাইরের আরোপিত ব্যাপার নয়, এ জেগে

উঠছে কেবল ছন্দের নবীন বিন্যাস থেকে, শব্দের সঙ্গে শব্দের সংঘর্ষ থেকে। সরে যাচ্ছে বাঙলা ছন্দের পুরোনো পরিমিত চালচলন, প্রতি পঙ্‌ক্তির অবসানে থেমে-থেমে কবিতা-পড়ার ক্লান্তিময় অভ্যাস যাচ্ছে ভেঙে। কিন্তু পুরোনো কবিতা পড়ায় অভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে সহজ ছিল না এটা বুঝে নেওয়া। সেইজন্য, অমিত্রাক্ষরের নূতনত্বে বিহ্বল বন্ধুদের কাছে লিখতে হয় মধুসূদনকে : 'আমার পরামর্শ হচ্ছে পড়ো, পড়ো, পড়ো'। প্রায় যেন ওই ভঙ্গিতেই বলতে শুনি 'স্বামীশিষ্য-সংবাদ'-এর বিবেকানন্দকে : 'পড়্ দিকি, কেমন পড়তে জানিস ?' শুনে এক শিষ্য যখন 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রথম সর্গ থেকে পড়লেন খানিকটা, পছন্দ হলো না স্বামীজীর। তিনি নিজেই তাকে পড়ে শোনালেন কী ভাবে ধরতে হবে এই লেখা।

তাহলে, দীর্ঘদিন পরেও অনেক পাঠকের পক্ষে দুরূহ ছিল অমিত্রাক্ষরের যথাযোগ্য পাঠ। কেন ? কেননা তাঁরা অনেকেই লক্ষ করেননি যে এ কবিতায় লুকোনো আছে কথা বলবার স্পন্দ। এই স্পন্দ তৈরি করবার জন্যে মধুসূদন চোদ্দ মাত্রার পয়ার-কাঠামো ঠিক রেখেও থেমে যেতে পারতেন লাইনের যে-কোনো জায়গায়। আট মাত্রাতেই একটা বিরতি দিতে হবে, এই পুবোনো পদ্যের ধারণা অগ্রাহ্য করে তিনি দেখছিলেন যে তাঁর কবিতায় যতি 'naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th and 12th !' কোন্ কোন্ মাত্রার পর বিরতি চলবে তার এই দীর্ঘ তালিকায় তিন মাত্রাকেও গণ্য করেন মধুসূদন। তিন মাত্রা ? তাহলে কি ছান্দসিকদের এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হলো যে অক্ষরবৃত্ত তিন মাত্রা অথবা বিজোড়সংখ্যক মাত্রার পর একেবারেই দাঁড়ায় না ? হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রশস্তিময় ভূমিকায় এইটুকু মাত্র দোষ নির্দেশ করেছিলেন যে বিরামযতির ভুলে এ কাব্য কোথাও কোথাও শ্রুতিদুষ্ট। কোথায় ? 'নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে/ গায়ক' অথবা 'কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটিরে / নীরবে' এসব অংশে 'গায়ক' বা 'নীরবে'

শব্দের পরে বিরতির ফলে—হেমচন্দ্রের ভাষায়—'পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ-হেতু শ্রবণকঠোর হইয়াছে'।

হেমচন্দ্র বুঝতে পারেননি যে স্রোত ভাঙতেই চেয়েছিলেন মধুসূদন। মিল্‌টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সকে প্রথম যুগেই যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরাও যেমন বিভ্রান্ত ছিলেন 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর কোনো কোনো লাইনে প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এর পরেই বিরতি দেখে, হেমচন্দ্রের আক্ষেপও সেইরকম। কেবল হেমচন্দ্রই বা কেন, রবীন্দ্রনাথও না কি প্রবোধচন্দ্রকে বলেছিলেন একবার: 'মধুসূদন অবশ্য "অকালে"র পর যতি দিয়েছেন। এটাকে অবশ্য এক রকম করে সমর্থন করাও যায়। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে, এ ছন্দে অযুগ্ম unit-এর পর যতি না দেওয়াই রীতি'।[১]

বস্তুত, এই রীতিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন বলেই মধুসূদন তাঁর ছন্দে আনতে পেরেছিলেন পৌরুষ। রবার্ট ব্রিজেস দেখিয়েছেন যে মিল্‌টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের সবচেয়ে বড় সামর্থ্যই হলো এর যতিগত বৈচিত্র্যে বা রূঢ়তায়। কোনো কোনো লাইনে যে একটি নয়, দুটি বিরতিও দেখা দেয়, এও ব্রিজেসের উৎসাহের বিষয়। মধুসূদন তাঁর অমিত্রাক্ষরে দুটি তো বটেই, কখনো-কখনো দুয়ের বেশি যতিরও সাহসিক প্রয়োগ আনেন। যেমন ধরুন:

নীরবিলা রক্ষোনাথ, শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,
কাঁদিলা, বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।

এই উদাহরণ, অথবা

শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!

১ দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫২, পৃ ১৮৪।

এসব কি ছন্দ-ক্লিষ্টতার উদাহরণ ? না কি ছন্দে এক জটিল যতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তাকে বয়স্কপাঠ্য করে তোলারই আয়োজন ? এর যতির বৈচিত্র্য কেবল এইটুকু নয় যে কোথাও চার কোথাও বারো কোথাও তিন মাত্রার পর বিরতি আছে এখানে ; তারই সঙ্গে গণ্য করতে হবে এর ভাবগত স্পষ্ট যতির ভিতরে ভিতরে পঙ্‌ক্তিগত অস্ফুট যতির একটা জটিল বুনন। তু'রকম যতির এই বুননটা শুনতে পেলে বোঝা যাবে কী ভাবে এ কবিতায় তিন মাত্রার বিরতি অনায়াসে সুষমা পেয়ে যায় আট মাত্রার লঘুযতির মধ্যে। হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষরে যে অক্ষমতা, তার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটি নিশ্চয় এই যে অযুগ্মমাত্রায় দাঁড়াবার সাহস তাঁরা অর্জন করেননি।

কথা থেকে মধুসূদন যে সুর আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, তার একটি পরোক্ষ উপায় তাহলে এই যতিবৈচিত্র্য, এই বাক্‌স্পন্দের প্রতি অভিমুখিতা। এরই সঙ্গে ছিল সহজতর এক প্রত্যক্ষ উপায়, আর সে উপায় হলো শব্দসংঘাতময় ধ্বনিসৃষ্টি। তাঁর স্পন্দ এগিয়ে ছিল কথা-বলার দিকে, কিন্তু অনেক সময়েই তাঁর শব্দ তা নয়। 'সাগরের তট যেন ঢেউয়ের আঘাতে' না বলে তাঁকে বলতে হয় 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে'। এ লাইন পছন্দ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, এ লাইনকে অবজ্ঞা করেছিলেন বুদ্ধদেব। শব্দব্যবহারের যে প্রবণতা ধরা পড়ে এর থেকে, সেই সংস্কৃতপন্থা অনেকেরই কাছে ছিল ধিক্‌কারের বিষয়। অনেকেই বুঝতে চাননি যে ছন্দে একটা উচ্চাবচতা সৃষ্টির জন্য মধুসূদনকে অগত্যা নিতে হয়েছিল এই পথ, বলতে হয়েছিল : Good Blank verse should be sonorous'। এখানেও তিনি মিল্‌টনপন্থী। একই ধ্বনির গম্ভীরতা রচনার জন্য মিল্‌টন বিসর্জন দিচ্ছিলেন তাঁর দেশীয় ইডিয়ম, ইংরেজিকে ঘুরিয়ে ধরছিলেন লাতিনের দিকে—অন্তত এই তো ছিল এজরা পাউণ্ডদের অভিযোগ। সাম্প্রতিক কালে বাঙলা দেশেও আমরা মধুসূদন বিষয়ে শুনতে পাই ঐ একই অভিযোগ, তাঁর কবিতার ভাষা বাঙলাই নয় এমন কথা,

উচ্চারণ করে বসেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা বুদ্ধদেব বসু। তাঁরা কখনোই বুঝতে চাননি এ কবিতায় ছন্দের সঙ্গে শব্দের জোরালো এক টানা-পোড়েনের রহস্য।

ফলে এঁরা, এই আধুনিকেরা, অনেকসময়ে পাউণ্ড বা এলিয়টের ধরনে এতটাই ভুল ভেবে বসেন যে মধুসূদনের ছন্দের কোনো প্রবহমান মূল্য নেই বাঙলা কবিতার ইতিহাসে, নিতান্ত নির্বীজ এই ছন্দ।

সত্যি কি তাই? কেন তা ভাবব? পরে আর অমিত্রাক্ষর লেখা হয়নি বলে? একেবারেই কি হয়নি লেখা? এমন-কী রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রথম পর্বের রচনায়, বিশেষত পদ্যনাটকগুলিতে, গণ্য করেননি কি এই ছন্দ? আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'র মতো আর কোনো যোগ্য কাব্যের বাহন হলো না অমিত্রাক্ষর, তাহলেই কি ফুরিয়ে যেত এর ঐতিহাসিক মূল্য? আমরা ভুলতে পারি না যে 'পদ্মাবতী' নাটকের ভাঙা অমিত্রাক্ষর থেকেই গড়ে উঠেছিল কথা-বলার যোগ্য গৈরিশ ছন্দ আর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাট্যসংলাপ, এরই আর-এক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার, এই দূরসূত্র থেকেই একদিন দেখা দিয়েছিল 'বলাকা'র মুক্তবন্ধ। স্বাভাবিকতার যে আগ্রহে আধুনিক কবি আজ এসে দাঁড়ান গদ্যছন্দে, তারই প্রথম পথ নয় কি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর? স্বাভাবিকতার এই দাবি তাঁর কাছে এতই মস্ত ছিল যে মুক্তবন্ধেরও আদি রূপ অল্প সময়ের জন্য স্ফুরিত হলো তাঁরই রচনায়। একদিকে যেমন 'ব্রজাঙ্গনা'র এক-এক কবিতায় তিনি সাজিয়ে তুলছিলেন এক-এক ভঙ্গির স্তবকবন্ধ, যেমন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি'তে দেখে নিচ্ছিলেন ঘন-পিনদ্ধ নূতন এক কাব্যরূপ, অন্যদিকে তেমনি ছোটো-বড়ো হালকা কয়েকটি নীতিকবিতায় ভেঙে দিচ্ছিলেন তিনি সব বন্ধন, তৈরি করছিলেন ছন্দের একটা আপাতমুক্ত চেহারা:

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন;

বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল
'ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?'
বণিক কহিল—'ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন বুঝি দুটি নাই।'

'বলাকা'র মুক্তি তাহলে বাঙলা কবিতায় কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, তার ছিল এই অতিদূর পূর্বপ্রস্তুতি। সুরে বসানো কথা হিসেবে নয়, কথা-বলার একটা সুর ধরিয়ে দেবার প্রাথমিক চেষ্টা থেকেই তৈরি হয়েছিল এসব ছন্দ-রূপ। এই প্রবণতাই হলো মধুসূদনের ছন্দে আধুনিকতার ইঙ্গিত।

১৯৭০

আধুনিক ছন্দ

বিষ্ণু দে আমাদের মনে করিয়ে দেন আরাগঁ-র এই উক্তি যে কাব্যের ইতিহাস হলো তার টেকনিকের ইতিহাস। টেকনিকের সেই ইতিহাস লক্ষ করে বলা যায়, ছন্দে সমর্পিত শব্দেরই নাম কবিতা। অবশ্য এ সংজ্ঞা সহজ ব'লেই জটিল; কেননা ছন্দ কাকে বলে, শব্দই-বা কী, এবং সমর্পণ কেমনভাবে সম্ভব, এসব চিন্তা যতক্ষণ না কবি, পাঠক বা সমালোচকের ধারণায় পৌঁছবে, ততক্ষণ এই সূত্রটি দিয়ে কবিতার রহস্য কিছুমাত্র ধরা যায় না। কোলরিজের 'শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠ ব্যূহ' অথবা মালার্মের 'শব্দই কবিতা' তত্ত্বকেও শিথিল অর্থে গণ্য করলে তুচ্ছ শোনায়। বস্তুত মনে হয় না যে অপৃথক্-যত্নজাত ছন্দ-শব্দের স্বতন্ত্র বিচার কোনো রকমেই সম্ভব। কবিতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ নেই, যে-কোনো শব্দই কবিতার শব্দ—এ কথা মেনে নেবার পরের মুহূর্তেই বলতে হয় যে তবু প্রাত্যহিকের শব্দে আর কবিতার শব্দে কতই ভিন্নতা! তবে কি ছন্দই এই ভিন্নতা এনে দেয়?

হয়তো ছন্দই, কিন্তু কোন্ ছন্দ? রবীন্দ্রনাথ যখন 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' উচ্চারণের মায়ামাধুর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর 'ছন্দ' বইতে, তখনো ছন্দকে ভাবা হলো শব্দনিরপেক্ষ অস্তিত্ব হিসেবে, গাণিতিক পরিমাপে যাকে আমরা অনায়াস অভ্যাসের মধ্যে পেয়ে যেতে পারি তেমন কোনো নির্দিষ্ট 'রূপ' হিসেবে। কিন্তু এ ছন্দ নয়। ছন্দ যেখানে cadence, যেখানে শব্দগুলির পরস্পর গ্রন্থনের ফল হিসেবেই একটা অগোচর প্রবাহ তৈরি হতে থাকে—কবিতা ভিতর থেকে বাঁধা আছে সেই অন্তর্লীন ছন্দের রহস্যে। আর এই বন্ধনেই যে-কোনো শব্দ হয়ে ওঠে কবিতার শব্দ। যদি সে-কথা উপলব্ধি করেন কবি, তাহলে হয়তো বহিরাচারী ছন্দ-মাপকে বর্জন করতে তিনি প্রয়োজনমতো তৈরি হন।

যদি পুরো গদ্যেও না নিয়ে আসেন কবিতাকে,—অনেকটা টাল-খাওয়া কিন্তু ভিতর থেকে সংবদ্ধ বৈচিত্র্যে কাব্যছন্দের মুক্তি সন্ধান করেন তিনি। তারই নাম মুক্তছন্দ বা vers libre।

কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসে দেখি তার উপাদানগুলির মুক্তিকামনা অল্পে অল্পে এগিয়ে আসে, লোকালোকের মধ্যে মুক্তিচলাচল। কবিতার জগৎ এবং গদ্যভাষণের জগৎ কি ভিন্ন? চলনশীল ট্রেন থেকে টেলিগ্রাফের তারগুলিকে যেমন একটু একটু মাথা তুলে মাটি থেকে অনেকটা উঠে যেতে দেখি, আবার যেমন হঠাৎ আঘাতে তারা নেমে আসে নিচে, কবিতার ভাষাও তেমনি যুগে যুগে একবার করে গদ্যের দিকে প্রত্যহের দিকে টান খেয়ে তবে ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ তাই মন্তব্য করেছিলেন: 'সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্যপদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন কিন্তু কৃতকার্য হননি। এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো বিরোধ ঘুচল'।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথে এসে এই পরম সফলতার সন্ধান কেবল বাঙলা কবিতার কথা মনে রেখেই সম্ভব, সুধীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এখানে বিশ্ব-ভূমিকার কথা ভাবেননি। আর বিরোধ মেটানো অর্থে এখানে ধরেও নেওয়া হয়েছে একেবারে গদ্যকবিতার জগৎকে। তবে বাঙলা কবিতাতেও গদ্য-পদ্যের বিবাদনিরসনে 'তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথই মোক্ষ' কি না, সে আজ বিতর্কের বিষয়। কেননা ভুলের বীজ হয়তো সূচনাতেই ছিল। পরীক্ষার ঐ নূতন পর্বেও ছন্দ-নিপুণ রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দকেই ভেবেছিলেন 'ভার্স লিবর' এর সমান। অমিয় চক্রবর্তীর এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্যি ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ভালো করে বিচার করেননি হুইটম্যানের ছড়িয়ে-পড়া গদ্যছন্দ আর ফরাসি-কবিতা-থেকে-পাওয়া এজরা পাউণ্ডদের মুক্ত-ছন্দে কতটাই প্রভেদ।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে ইংরেজি-মার্কিন কবিতার ঘোষণা ছিল, 'in poetry a new cadence means a new idea'।

অতএব নূতন ছন্দস্রোত সঞ্চারের কথা ভেবে তাঁরা মুক্তছন্দের উপযোগিতা বুঝেছিলেন, আবার সেই মুক্তি যেন বিশৃঙ্খলার সুযোগ না হতে পারে সে সমস্যা মনে রেখে শব্দসজ্জায় তাঁরা কঠোর অনুশাসনও মেনেছিলেন। একটিও অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার সম্ভব নয়, এই নির্দেশের দ্বারা, বাইরের দিকে যা মুক্ত তাকে ভিতর থেকে বিন্যস্ত করে নেওয়া হলো গাঢ়তায়—একথা কবিরা ভোলেননি।

এ-আন্দোলনের প্রভাব বাঙলা কবিতায় পৌছতে অনেক সময় লেগেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত এর সর্বময় প্রভাব কতটা এখানে পৌছতে পেরেছে তাও সন্দেহের বিষয়। রবীন্দ্রভক্ত তরুণ পাউণ্ড 'গীতাঞ্জলি'র স্পন্দনে মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু পরিবর্তে ইমেজিস্ট কাব্যধারার কোনো ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ আত্মসাৎ করেছিলেন বলে অবধারিত প্রমাণ দেখি না। অবশ্য প্রায় সমকালেই তিনি 'বলাকা'য় দেখতে পেলেন 'শব্দময়ী অপ্সররমণী'কে, বোঝা গেল অনেক পরে জীবনানন্দ কেন বলবেন, 'চোখও অনুভব করে সেই ছন্দ-বিদ্যুৎ', তাহলেও এটা ঠিক যে 'বলাকা'র ছন্দ পশ্চিমি অর্থে মুক্ত নয়, তার 'মুক্তবন্ধ' নাম মাত্র স্বীকার্য হতে পারে। কারণ একদিকে যেমন গাণিতিক অর্থে ছন্দশাসন থেকে মুক্তি পায়নি এই 'বাসাছাড়া পাখি', ভেঙে দিতে পারেনি ছন্দের মূল কাঠামো, অন্যদিকে ঠিক তেমনি শব্দব্যবহারের ভঙ্গিতেও আছে শিখরস্পর্শিতার আবেগ, কিছু বা বিলাস, 'পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে'র মদিরতা। ইতিমধ্যে প্রমথ চৌধুরী আর যতীন্দ্রনাথেরা বড়ো হচ্ছিলেন তাঁদের 'হিরণ ঝাঁটার কিরণ-কাঠি' নিয়ে, সুধীন্দ্রনাথেরা অল্প পরেই এই বিচারে নামছিলেন যে 'অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে "বলাকা"র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ ঠেকে, মনে হয় এ ইতরের সঙ্গে ঘর করার জন্য দরকার এমন মুখরাকে যে অমর্যাদায় নুইবে না, অপমানের সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে'। সুধীন্দ্রনাথের বিচারমতো 'পলাতকা'তেই নয় অবশ্য, বরং 'পুনশ্চ'র গদ্যছন্দে এসেই অভব্য বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে আপোসের একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। গদ্যপদ্যের বিরোধভঞ্জনে এই ভূমিকাকেই অনুজ

কবি মনে করেছেন মোক্ষ।

কিন্তু এইখানেই হয়তো বিপদের সূত্রপাত, নৈয়ায়িক বিপর্যয়। গদ্যছন্দে যে ছন্দোমুক্তি কামনা করেছেন কবি, তার প্রকৃতি যেমনই হোক, কবিচেতনায় তার দাবি ছিল কোন্ দিক থেকে সেইটে প্রথম ভাবতে হবে। কেবলমাত্র অভব্য বস্তুতন্ত্রের প্রতিমান রচনার জন্যই কি গদ্যছন্দ—অর্থাৎ, গদ্যপদ্যের বিরোধ-নিষ্পত্তি? এ হলো একপেশে ভাবনা, অন্তত পশ্চিমি মুক্তছন্দ বা গদ্যছন্দের দাবিমূলে এইটেকেই সবচেয়ে গুরুত্বময় আদর্শ বলে বোধ হয় না। New Cadence বহন করে আনবে New Idea, ছন্দ এবং ভাবনার লীন অন্তর্যোগে ক্রমশ ভব্য এক কবিতার জগৎই তৈরি হবে শেষ পর্যন্ত, একথা তাঁরা ভোলেননি। এমন-কী, পাউণ্ড মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বাগ্মিতায় নয়, সংগীতের মধ্যেই মুক্তছন্দের সফলতা। রবীন্দ্রনাথও জানতেন সেকথা, নইলে 'যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি' সেই জলেস্থলে আপোসের প্রসঙ্গ তুলতেন না তিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালভূমিকায় জটিল এক অন্তঃসংঘাতে নিজের মধ্যে কিছু অসতর্ক শিথিলতা টেনে নিয়েছেন মনে হয়। বেড়াভাঙা স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ভাবতে গিয়ে তিনি যেন ঈষৎ ভ্রান্ত হলেন, শব্দগত অতিচার তাঁর ছন্দোমুক্তিকে ভিতর থেকে শিথিল করে দিল, বানিয়েতোলা কথায় অনেক সময় তাঁর সার্থকতার দিকটা গেল হারিয়ে। 'বঙ্গসরস্বতীর ধূলায় উপুড় হইয়া পড়িবার আর বিলম্ব নাই'—'পৃথিবী' কবিতা সম্পর্কে রক্ষণশীলদের এই আক্রমণকে আমরা উপহাস করতে পারি, কিন্তু তখন মনে রাখতে হবে যে কবি নিজেই এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন অনেক সময়ে, অনেক সময়ে তিনি এই সাবধানতা গণ্য করেননি যে গদ্যকে কোনোক্রমে ভেঙে দিলেই আমরা কবিতার জগতে পৌঁছই না। 'শেষ সপ্তক'-এর কোনো কোনো রচনায় যে ভাবে প্রাত্যহিক চিঠিপত্রকেই কাজে লাগিয়ে নেন কবি, অবিশ্বাসীর সংশয়কে তা পুরোপুরি নিরস্ত করতে পারে না।

পাউণ্ড ছন্দের একটা সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন এই বলে যে এ হলো 'a form cut into time'। গদ্যকে বলা যাক স্বতন্ত্র আর-একটি বিন্যাস যা ভাবনাজগতের অন্তর্বর্তী দেশকে (inner space) রূপায়িত করে আনে। এই গদ্যেরই মধ্যে পরিমিত সময়ের সঞ্চার করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একরকম কাব্যিক গদ্য বা rhythmic prose রচনা করেছেন কখনো কখনো, আবার অন্যদিকে পদ্যছন্দ থেকে নিয়মিত সময় সরিয়ে নিয়ে তাকে খুলে দিতে চেয়েছেন গদ্যের দিকে, হয়ে উঠেছে রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দ। এ কথা সর্বত্র সত্য নয়, আর সত্য নয় বলেই গদ্যকবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন কত সময়ে! কিন্তু তবু অন্তর্গত এই দুর্বলতার বীজ ছিল বলেই অনুকারীদের পক্ষে সর্বনাশের সূত্রপাত সম্ভব ছিল, অথবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও অনিবার্য ছিল অল্পকাল পরেই 'প্রান্তিক'-এর ঘনবদ্ধ পদ্যছন্দে ফিরে আসা।

এই প্রত্যাবর্তন ব্যাখ্যা করার সময়ে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে ঠিক-ঠিক কথা বলার স্পন্দ কমই আছে। 'মাছের কানকো, ছাইপাঁশ আবর্জনা আরো কত কী যে' এসব তালিকা ক্রমশ তাঁর কবিতার অন্তর্গত হচ্ছিল বটে, কিন্তু এই সংগ্রহের পটভূমিতে শ্রমের চিহ্ন কত বেশি। উপরন্তু ক্রিয়াপদের বিপর্যাস ইত্যাদি কৌশলের দ্বারা বাক্‌স্পন্দ রচনার পথ সুগম হয়নি, একটা ম্যানারিজম মাত্র তৈরি হয়েছে। বরং শেষ কয়েক বছরের রচনায় অনেক আত্মস্থ লাগে তাঁকে। তখন দেখি বাচনগত শ্বাসক্ষেপকে অনেক বেশি মর্যাদা দিতে পারছেন কবি। নিয়মিত ছন্দ আর সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সত্ত্বেও

রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম
জানিলাম
এ-জগৎ স্বপ্ন নয়

এই উচ্চারণের মধ্যে বাক্‌পর্বগত স্বাভাবিকতাকে কবি অনেক সহজে আয়ত্ত করছেন, এই কি মনে হয় না?

আধুনিক কবিও একথা ঘোষণা করেন যে 'কবিপ্রতিভার একমাত্র

অভিজ্ঞানপত্র ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য'। যিনি এটা বলেছিলেন, সেই সুধীন্দ্রনাথ আর তাঁর বন্ধু বিষ্ণু দে তো প্রকাশ্যেই গদ্যছন্দের প্রতি বিরূপ। একথাটা পাঠক অনেক সময়ে ভুলে যান। তাই তিনি ভুলে যান যে গদ্যছন্দেই আধুনিক কবিতার প্রাণ নয়, আধুনিক কবিতার পরিচয় বাক্‌ছন্দে। প্রাত্যহিক বাচনের শব্দভঙ্গি, স্বরভঙ্গি আর শ্বাসক্ষেপভঙ্গি যে ছন্দে একত্রে বেঁধে নেওয়া যায়, সেই ত্রিবেণীর প্রতি আধুনিক কবিতার দৃষ্টি, যাকে ভুল করে কেউ গদ্যছন্দ ভাবেন। গদ্যছন্দ বা মুক্তছন্দ ঐ সিদ্ধির পথে অন্যতম উপায়, কিন্তু এর কোনোটাই একমাত্র পন্থা নয় এবং ইমেজিস্ট সদস্যরাও জানিয়েছিলেন যে তাঁরা মুক্তছন্দকেই কাব্যরচনায় একতম প্রকরণ বলে দাবি করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকবিতার ছন্দের চেয়ে বরং তাঁর অন্ত্যকবিতার ছন্দে এই বাক্‌রীতিকে অর্জন করেন আর-একটু সার্থকভাবে। 'প্রান্তিক'-এ কিংবা 'শেষ লেখা'য় বাক্যরচনার অতিসচেতন বিপর্যাস নেই, ছন্দঅভাব মিটিয়ে নেবার জন্য অলংকারচাতুর্যের প্রতি অনাবশ্যক পক্ষপাত নেই, অথচ আর্ষ মন্ত্রের উদাত্ততা এবং প্রাত্যহিকের বাচন সেখানে কত অনায়াসে সাযুজ্য পেল। এ-ও পূর্ণ অর্থে মুক্তছন্দ নয়, কিন্তু তার সবচেয়ে সমীপবর্তী রূপ। এই রূপের দিকে দৃষ্টি থেকেই আমাদের আধুনিক ছন্দের জন্ম।

১৯৬৪

মুক্তছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ

ভারতচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ চর্চার ছোটো একটি ধারা চলছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পর এই প্রবাহ একেবারেই থেমে গেল। থেমে গেল এমন এক সময়ে, যখন বিচিত্র আঙ্গিকের চর্চায় কবিদের আগ্রহ কম তো ছিলই না, বরং নানা সংগত কারণে বেশি ছিল বলেই ধারণা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর শেষ দশ বছরে কবিতার শরীর বিষয়ে অনেকটাই চিন্তিত ছিলেন। একদিকে গদ্যকবিতায় তার প্রমাণ, অন্যদিকে ছন্দ-বিষয়ক নানা নিবন্ধের সমকালীন প্রকাশেও তার ইঙ্গিত ধরা পড়ে। এই শারীরিক চিন্তার সময়েও সংস্কৃত ছন্দকে বাঙলায় আনবার আর উল্লেখযোগ্য নূতন চেষ্টা যে হলো না, তা নিশ্চয় অকারণ নয়। বস্তুত, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে যে সফলতা অর্জন করেছিলেন সেই সিদ্ধির ধরনটাই আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে ব্যর্থতা ছাড়া ও-পথে আর কিছুই আমরা আশা করতে পারি না। ঐ ছন্দের রহস্যকে পুরো আয়ত্ত করবার পর কবিরা দেখতে পেলেন যে বাঙলার সঙ্গে তার প্রভেদ এমনই মূলের যে সেখানে আর কোনো আপোস চলে না।

তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই ভাবছিলেন যে বাঙলায় এই ছন্দকে নিয়ে করবার কিছু আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও এ আক্ষেপ তাঁর মুখে শুনতে পাই যে সংস্কৃত ধ্বনিস্পন্দকে অনুকরণ করবার যথাযথ প্রয়াস বাঙলায় আর হলো না। তখন ভাবতে ইচ্ছা হয়, সে চেষ্টা তিনি নিজে কতটা করেছেন। প্রায় সর্বত্রগামী এই কবির লেখনী সংস্কৃত ছন্দকে কি প্রায় এড়িয়েই যায়নি ? অবশ্য যখন মনে করি যে তিনি ছিলেন বিশেষ করেই সুষমা ও সংগতির সাধক, কৌশল যাঁর অভিপ্রায়ের উলটো, তখন এই ঘটনাকে মনে

হয় নিতান্ত স্বাভাবিক যে সংস্কৃত ছন্দে তিনি বাঙলা কবিতা লিখবেন না।

এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়বে তাঁর রচিত কিছু গান যা বাঙলার স্বাভাবিক উচ্চারণে পড়বার মতো নয়: 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' 'চাস্পৃহচঞ্চল' অথবা 'দেশ দেশ নন্দিত করি'র মতো রচনাবলি। কিন্তু এই উদাহরণগুলিকে সংস্কৃত ছন্দের বাংলা চেহারা বলা কিছু কাজের কথা নয়, এই শুধু বলা যায় যে বাঙলা কবিতা পড়বার জন্য এখানে ব্যবহার করতে হলো সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতি।

এই শেষ কথাটি মধ্যেই আছে দুর্বলতার বীজ। অসংগত বিকৃত উচ্চারণে কেন আমরা কবিতা পড়তে বাধ্য হব, এই পীড়াজনক ভাবনা পাঠককে কখনোই স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছতে দেয় না এবং কবির অভিপ্রায়ও প্রায় সমূলে নষ্ট হয়। এবং এইখানে রবীন্দ্রনাথ এতই সংগত আর সতর্ক যে তিনি পঠনীয় কবিতায় এই রীতির প্রয়োগ করতে চান না, বিশেষ এই ভঙ্গিটি তোলা থাকে সেই কয়েকটি রচনার জন্য যা সুরারোপিত, আসলে যা গান।

পুরোনো কবিদের ব্যবহারে সংস্কৃত ছন্দ একটু মজাদার টুংটাং আওয়াজ তুলে চুপ করে গেছে। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ যা সহজেই বুঝেছেন, তাঁরা তা কখনোই বোঝেননি। ফলে তাঁরা সংস্কৃত ছন্দকে আনেন সংস্কৃত উচ্চারণে এবং এর প্রবেশ তাঁরা কেবল গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তখন, এইসমস্ত কবিতার সামনে এসে আমরা কেবল বিমূঢ়ই হই:

> দেখহ সুন্দর লৌহরথে চড়ি লৌহপথে কত লোক চলে,
> ষষ্ঠমুহূর্তক মধ্য করে গতি যোজন পঞ্চদশের পথে।
>
> (ভুবনমোহন রায়চৌধুরী)

বা, কিঞ্চিৎ পরে ভাস্কর উগ্রভাবে
হরে কুয়াশা স্বকর প্রভাবে। (বলদেব পালিত)

এইভাবেই লিখেছিলেন ভারতচন্দ্র বা হেমচন্দ্র। এঁদের বিপদ

কোথায়, সত্যেন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে দীর্ঘ স্বরের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ বাঙলা ভাষায় অস্বাভাবিক শোনাবে। এই কবি প্রথম থেকেই তাই খুঁজতে চান ভাষার প্রকৃতি, এবং অচিরেই তিনি দেখতে পান যে সংস্কৃত লঘুগুরু মাত্রাভেদ বাঙলা উচ্চারণে যদিও লুপ্ত, তবু বাঙলার নিজস্ব উচ্চারণে লঘুগুরুর আর-একরকম প্রভেদ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ঈ বা উ আমাদের কাছে হ্রস্ব উচ্চারণেরই সদৃশ, কিন্তু আমাদের উচ্চারণেও পৃথক হয়ে যায় রুদ্ধ দল আর মুক্ত দল। 'জ্বলন' আর 'জ্বলছে' এই দুটি শব্দেই দুই দল, কিন্তু এর প্রথম 'জ্ব' হ্রস্ব, আর দ্বিতীয় 'জ্ব' (-জ্বল্) দীর্ঘ। তাঁর কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ এই পর্যবেক্ষণ-কেই কাজে লাগালেন নিপুণ কৌশলে। এর ফলে, উচ্চারণগত কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েও বাঙলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার হতে পারল খানিকটা সহজ।

সত্যেন্দ্রনাথের এই সংস্কৃত ছন্দ চর্চায় যে প্রভূত শক্তির পরিচয় মেলে, তা যথেষ্ট অভিনন্দন পেয়েছে কি না সন্দেহ। 'ছন্দের জাদুকর' এই নামের পতাকা নিয়ে প্রমত্ততার প্রদর্শনী আমরা দেখেছি, কিন্তু যেখানে তাঁর যথার্থ শক্তির প্রকাশ সে সম্পর্কে সাধুবাদ তুলনায় কম দেখতে পাই। বিশেষত বিহ্বল লাগে যখন দেখি, রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব পর্যন্ত স্বয়ং কবিরাই এ-বিষয়ে তাঁকে ভুল বোঝেন। তার প্রমাণ ধরা পড়ে মন্দাক্রান্তা বিষয়ে এই কবিদের আলোচনায়, যেখানে এঁরা দুজনেই একমত যে মন্দাক্রান্তার প্রতি চরণে চার পর্ব, আর সেই পর্বের মাত্রাক্রম হলো ৮+৭+৭+৫। বাইরের বিচারে এই হিসেব ভুল নয়, কিন্তু অত্যন্ত গৌণ। একটি পর্বে কত মাত্রা, সংস্কৃত মাত্রিক ছন্দে সেটা মূল বিবেচ্যই নয়। বিচার করবার বিষয় হচ্ছে, সেই মাত্রাসমষ্টিতে লঘুগুরু ধ্বনির যথাযথ সন্নিবেশটি কেমন। এমন নয় যে এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল, ১৩২৪ সালে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেওছেন: 'সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার

ছন্দের অঙ্গ।' কিন্তু এর তেরো বছর পর মন্দাক্রান্তার যে উদাহরণ তিনি রচনা করলেন তাতে ক্ষুণ্ণ হলো এই 'অঙ্গ', তা হলো পরিষ্কার ৮+৭+৭+৫-এর ক্রম, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতেও তা হয়ে রইল ক্লিষ্টতারই উদাহরণ :

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি' সবে দারুণ জ্বালা।

'নির্বাসনে সে রহি' বাঙলা অথবা সংস্কৃত কোনো রীতিতেই তেমন স্বচ্ছন্দ নয়।

এর তুলনায় 'পিঙ্গল্ বিহ্বল্[১] ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও' যে ধ্বনিমহিমাতেও মন্দাক্রান্তার অনেক সমীপবর্তী, তার মূল কারণ, উত্থানপতনের একটা সুনির্দিষ্ট পারম্পর্য এখানে পূর্বাপর ব্যবহৃত। এইটে লক্ষ না করলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে 'মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর / বরণ তোমার তমঃশ্যামল' কবিতায় 'মূর্ত' না লিখে 'মূরৎ' লেখা হয়েছে কেবল 'মহৎ' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে,—এই মূল কথাটাই তাঁর জানা হবে না যে ঐ পঞ্চচামর ছন্দে প্রতিটি বিকল্প দল সাজানো আছে হ্রস্বদীর্ঘের ক্রমে। 'মূরৎ' এবং 'মূর্ত'র মূল্য সেখানে এক হতে পারে না।

এতে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের মহিমাই প্রমাণিত হয় যে মন্দাক্রান্তার জটিল ক্রম (— — — —, ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ —, — ⌣ — — ⌣ — —)[২] মেনে নিয়ে তিনি যে কবিতা লিখলেন, তার রচনাসূত্র চোখে পড়ল অল্প লোকেরই। অর্থাৎ যে ভঙ্গি তাঁর ছন্দের মূল ভঙ্গি তাকে তিনি আত্মসাৎ করে প্রায় গোপন করতে পেরেছেন, এখানে তিনি জয়ী।

কিন্তু এতদূর সফলতার পরেও দেখা গেল যে মসৃণ অনায়াসে এই চর্চা বাঙলা কবিতার অঙ্গীকৃত হলো না। কেননা যে মাত্রাসমতা

১ 'কাব্যসঞ্চয়ন'-এর সাম্প্রতিক সংস্করণগুলিতে কবির অভিপ্রেত এই হস্‌চিহ্নগুলি আপত্তিকর ভাবে বর্জিত।

২ রুদ্ধদল : —, মুক্তদল : ⌣।

বাঙলা ছন্দের অভ্যস্ত দাবি, সংস্কৃত ছন্দ তা মানে না। ফলে সত্যেন্দ্রনাথের এইসব কবিতা অন্যরকম একটা ধ্বনিতরঙ্গ তুলেও আস্তে আস্তে মুছে গেল পাঠকের কান থেকে, এইসব উদাহরণ :

সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়ল আজ
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ-বিলোল
রক্ত চোখ!

অথবা,

উড়ে চলে গেছে বুলবুল
শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর—

এরা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে বাঙালির প্রকৃতির সঙ্গে এদের আন্তরিক অসদ্ভাব।

তখন মনে হয় যে বাঙলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের ইতিহাস তার যোগ্য পরিণামে এসেই থেমেছে। কিন্তু তবুও, সত্যেন্দ্রনাথের এই মহৎ ব্যর্থতার পরেও, একটা প্রশ্ন মনে জাগে। আমাদের ভাবতে ইচ্ছে হয় যে উপরের ঐ উদাহরণগুলির একটা ভাঙা চেহারা থেকে সত্যেন্দ্র-পরবর্তী কবিরা অন্য একটা ইঙ্গিত পেতে পারতেন কি না, এই ব্যর্থতার পরবর্তী কোনো চেষ্টা থেকেই জন্মাতে পারত কি না বাঙলার সেই ছন্দ— যাকে বলা যায় মুক্তছন্দ, ফ্রী ভার্স।

তিরিশের যুগ বাঙলা কবিতায় ছন্দোমুক্তির যে আন্দোলন তৈরি করেছিল, পরবর্তী পঁচিশ বছরে অল্পে অল্পে তা মন্থর হয়ে আসে। তার মানে এ নয় যে ঐ মুক্তিসাধনা কোনো অর্থে কোনো কবিরই মধ্যে

আর দেখা যায়নি,—সেই সাধনা নিহিত ছিল কবিদের সতর্ক গোপন চারণায়, তার বেগ মন্থর, তার চলন পরিমিত, কখনো-বা সংশয়াতুর। রবীন্দ্রনাথ অন্তত তাঁর শেষ বয়সে যে দ্রুত উদ্দাম পদক্ষেপে একসঙ্গে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন গদ্যকবিতা পর্যন্ত, পরবর্তী যুগ তার শেষ পরিণামকে একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই—বা, এইটেই হয়তো স্বাভাবিক ছিল—যে, যে-মধ্যবর্তী স্তরকে স্পর্শ করে আসেননি রবীন্দ্রনাথ নিজে, আজও পর্যন্ত বাঙলা কবিতা সেই দেশকে খুব সাহসের সঙ্গে জিতে নিতে পারল না। ছন্দসিদ্ধ রচনা এবং গদ্যছন্দের মধ্যবর্তী সেই অল্প-দেখা দেশটিরই নাম বলা যায় ফ্রী ভার্স।

গদ্যকবিতাকে একসময়ে অনেক মর্যাদা পেতে দেখেছি আমরা, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সে সাবালক হবার আগেই তার গৌরব অনেকটা হারাল। অনেকেই অবশ্য ভুল করে ভাবেন যে আজকের কবিতা মাত্রেই গদ্যকবিতা। তাঁরা জানেন না যে আধুনিক কোনো কোনো কবি এই নূতন ছন্দ রূপের প্রতি স্পষ্টতই বিমুখ। ছন্দের মুক্তিসাধনায় গদ্যকেই যদি ভাবি শেষ পরিণাম, তাহলে হয়তো সাম্প্রতিক এই বিরূপতায় আমরা দুঃখ পেতে পারি। কিন্তু তখন মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, অবাধ মুক্তিতে বস্তুত কোনো আনন্দ নেই। জটিল বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রত্যাশায়, বাঁধন পরানো বাঁধন খোলানোর খেলাতেই শিল্পীর তৃপ্তি। ফ্রী ভার্সে একই সঙ্গে পাই এই বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির খেলা।

কোনো এক ফরাসী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপচারিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে ফ্রী ভার্স তিনি প্রচুর লিখেছেন। তখন ফ্রী ভার্স শব্দে তিনি কী ইঙ্গিত করতে চান তা জানতে ইচ্ছে হয়। 'বলাকা' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি vers libre-এর যে ব্যাখ্যা করেন তাতে কখনো মনে হয় যে ঐ অভিধায় দুই-তিনের বিষম ছন্দই তাঁর

উদ্দিষ্ট[৩], আবার কখনো-বা দেখি তাঁর লক্ষ্যে আছে 'বলাকা'রই কবিতা[৪]। অন্তপক্ষে ছাত্রপাঠ্য রচনাবলিতে ফ্রী ভার্স শব্দে কখনো গদ্যকবিতা কখনো 'বলাকা'র ছন্দ উদ্দিষ্ট হতে দেখে ঐ শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে বিপন্ন বোধ করা স্বাভাবিক। আবার, বুদ্ধদেব বসু যে বলেন, 'ওদের ফ্রী ভার্স হলো মিশ্রছন্দ যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়' সে কথাও যথেষ্ট স্পষ্ট লাগে না, কারণ সাধারণভাবেই কোনো ইংরেজি কবিতায় ব্যবহৃত হতে পারে বিচিত্র ধরনের পদ (foot), হতে পারে মিশ্রছন্দের উদাহরণ, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত না-ও পৌঁছতে পারে ফ্রী ভার্সে।

বস্তুত, ইংরেজি আলোচনাতেও শব্দটির প্রয়োগ তেমন কোনো নির্দিষ্টতা পায়নি। মূল ফরাসীতে vers libre আর vers liberes-এর মধ্যে যে ভিন্নতা গণ্য করা হয়, তারও খুব নিশ্চিত অনুসরণ নেই এসব আলোচনায়। মুক্তিই শেষ কথা। কিন্তু সেই মুক্তি কোন্ পর্যন্ত পৌঁছলে বলা যাবে যথার্থ ফ্রী ভার্স? অনেকে এমন কবিতাকে বলেন ফ্রী ভার্স যেখানে মিলও নেই ছন্দও (metre) নেই, যেমন হুইটম্যানে। অথবা, মিল নেই অথচ মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের মাপা লাইনেও লেখা নয়, কিংবা মিল আছে কিন্তু নিরূপিত কোনো ছন্দ নেই—কারো মতে এমন কবিতাও ফ্রী ভার্সে লেখা।

গদ্যকবিতায় কোনো পরিমিত ছন্দতাল নেই বলে তাকে verse বলা নিরর্থক। কিন্তু উপরোক্ত অন্য সূত্রাবলিকে স্বীকার করে

৩ 'Vers libre দেখলেও দেখা যেত সেখানেও ছন্দের ধর্ম আছে। এ যে বিশ্বের ধর্ম। তা সংখ্যাতে দুই আর তিন। দুই ও তিন সংখ্যায় মূলগত প্রভেদ রয়েছে। তা নিয়েই সম-অসম-বিষম এই বৈচিত্র্য। অর্থাৎ দুই-তিন বা দুই এবং তিন।...সংস্কৃত ছন্দে বিষমের দেখা পাওয়া যায়। Vers libre-এও তা আছে।'

দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্যপরিক্রমা, ১৯৫৫, পৃ ৪০

৪ 'বলাকার এই কবিতাগুলিতে ছন্দ মুক্তি লাভ করেছে। হয়তো ফরাসী Vers libre-এর সঙ্গে এর তুলনা কেউ কেউ দেবেন।' তদেব, পৃ ৪২

রবীন্দ্রনাথের অমিল মুক্তবন্ধকে কেউ হয়তো ফ্রী ভার্স বলতে চাইবেন, যার প্রয়োগ পাই 'পরিশেষ'-এর কোনো কোনো কবিতা থেকে, 'বাঁশি'র মতো রচনা থেকে। 'পরিশেষ'-এর এই বিশেষ কবিতাগুলি পরে অবশ্য গৃহীত হয়েছে 'পুনশ্চ' বইটিতে।

একবার যখন রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দে মুক্ত গতির একটা আভাস দেখেছিলেন, তখন এর অসমান পর্বভাগের কথাই তাঁর মনে ছিল: 'তার ভাগগুলি অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভারসামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাত প্রতীয়মান মুক্ত গতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—মেঘৈর্ মেদুর। মম্বরং বনভুবঃ। শ্যামস্তমা। লদ্রূমৈঃ।' অন্য দিকে ইংরেজি ছন্দও সহজ পদ্যরীতি থেকে, প্রতিপর্বের সুমিত চলন থেকে মুক্ত হয়েছে অনেক আগেই। সেইসব রচনা দুর্বল পদ্য বলেই গণ্য, যা বই মিলিয়ে লেখা, যার প্রতি পর্বই আয়াম্বিক, অথবা প্রতিটি অ্যানাপেস্ট। অর্থাৎ ব্যতিক্রম বা variation ইংরেজি চরিত্রে আছে, এবং সাধারণ কবিতাতেই সেই ব্যতিক্রম কখনো কখনো এতদূর পৌঁছয় যে কবিতা পড়ার অভ্যাস নিবিড় না হলে তার ছন্দ-ভাগ মনে হতে পারে অসাধ্য।

অর্থাৎ এইসব ছন্দে অভ্যন্তরীণ মুক্তির আয়োজন অনেকটাই তৈরি আছে, সেইটেই যদি আর একটু খুলে দেওয়া যায়, পঙ্‌ক্তিগুলিকে অসম এবং মিলহীন করে তোলা হয় তাহলে মুক্তির স্বাদ পৌঁছয় অনেক দূর। অসমপঙ্‌ক্তিক অমিল বাঙলা ছন্দ—যেমন 'বাঁশি' কবিতার ছন্দ—সেই মুক্তির তুল্য নয় একেবারেই। কেননা বাঙলা ছন্দের কঠিনতম বন্ধন তার পর্ব-পরিকল্পনায়, পর্বসুষমায়। পর্বের ভেতরকার এই সংগঠন ভাঙতে না পারলে সেই মুক্তি নেই, ফ্রী ভার্সের যা প্রত্যাশা। অর্থাৎ যে মাত্রাসমতা বাঙলা ছন্দের মূল সূত্র, ফ্রী ভার্স আঘাত করবে সেইখানে। আক্রমণ করে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে এতে কি বাঙলা ছন্দের স্বভাবকেই আমরা অতিক্রম করতে চাইছি

না? তার উত্তরে হয়তো এই বলা যায় যে ছন্দের স্বভাবকে নতুন দিকে চালিত করাই হলো কবির স্বভাব।

তাহলে বাঙলা ফ্রী ভার্সে আমরা প্রত্যাশা করব মিশ্রছন্দ। সেখানে অন্ত্য মিল থাকবে কি থাকবে না তা খুব বড়ো কথা নয়। কিন্তু পর্ব-গঠনে বা সমগ্র ছন্দগঠনে নির্দিষ্ট কোনো নীতি সেখানে থাকবে না।[৫] অথচ তা সত্ত্বেও তার স্পন্দ যে গদ্যের নয়, পদ্যেরই, এই কথাটা স্পষ্ট করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ থেকে দীর্ঘ একটি উদ্ধৃতি এখানে ব্যবহার করতে চাই:

> বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল বলাকা পলাতকায়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এলো বটে, তবু মেয়ে কম্পার্টমেণ্ট রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না। এমন কী সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততোটা সাহসও প্রকাশ পায় নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি
>
> বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
> সিঅল পবণ মন হরণ
> কণঅ পিঅরি ণচই বিযুরি ফুল্লআ ণীবা
> পত্থর বিত্থর হিঅলা পিঅলা (ণিঅলং) ণ আবেই।
>
> মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাঙলায় লেখা যাক—
>
> বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
> শীতল পবন বহে সঘনে
> কনক বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে
> নিষ্ঠুর অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

৫ একই কবিতায় অবশ্য বিভিন্ন ধরনের ছন্দ চলতে পারে ফ্রী ভার্স না হয়েও, যেমন 'পূরবী'র "আশা" অথবা 'নবজাতক'-এর "ইস্টেশন"। সত্যেন্দ্রনাথেও এমন ব্যবহার আছে, "পাল্কীর গান" বা "দূরের পাল্লা"য়। আধুনিক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে এই ভঙ্গি এক সময়ে ব্যবহার করেছেন খুব বেশি। এসব ক্ষেত্রে, বস্তুত, কবিতায় যখন একটা নতুন চাল বা Movement শুরু হয়, তখন ছন্দ পালটায়। নতুবা এর মধ্যে গঠনগত আর কোনো নৈরাজ্য নেই।

বাঙালি পাঠকের কান একে রীতিমতো ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক, এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে; সেটুকুও যদি ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে কাব্যকেই কি ভেঙে দেওয়া হলো। দেখা যাক।

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরণ ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ
বজ্র উঠছে গর্জন করে
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এলো না।

('ছন্দ')

এই উদ্ধৃতিতে যে তিনটি কবিতাংশ দেখতে পাচ্ছি, তার দ্বিতীয়টি হলো বাঙলা ফ্রী ভার্সের যথার্থ উদাহরণ এবং তৃতীয়টির সঙ্গে দ্বিতীয়টির তুলনাতেই ধরা পড়ে যে, পর্ব এবং ছন্দে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েও তাতে ধ্বনিত করা যায় পদ্যেরই আওয়াজ, এবং তা যে অনিবার্য কোনো অসংগতি বা পীড়ার সৃষ্টি করবে এমন ধারণারও কোনো মানে নেই।

৩

উপরের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির মধ্যে সতর্ক পাঠক ছন্দ-বিবর্তনের একটি প্রচ্ছন্ন ইতিহাসই যেন দেখতে পাবেন। কবির দিক থেকে দেখতে গেলে ঐ অংশ তাঁর গদ্যছন্দ রচনার কৈফিয়ৎ, কিন্তু এই কৈফিয়ৎ বলতে গিয়েও তাঁকে দেখাতে হলো মধ্যবর্তী একটি স্তর। তখন, একটি বৃহত্তর সত্যের ইঙ্গিত কি এই উদাহরণে আমরা পাই না? মনে হয় না কি, গদ্যছন্দের পূর্বতন এক স্তর হিসেবে এই মুক্তছন্দের আবির্ভাব বাঙলা কবিতায় প্রত্যাশিত ছিল?

অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই মুক্তছন্দ প্রায় নেই, গদ্যছন্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাঙলা কবিতাকে যেন এক স্তর ডিঙিয়ে নিয়ে

গেল। 'স্ফুলিঙ্গ' থেকে দুটি কবিতাকণার কথা বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন তাঁর 'সাহিত্যচর্চা'য় অথবা প্রবোধচন্দ্র-নির্দেশিত 'বেঠিক পথের পথিক' কবিতাতেও কখনো কখনো দুই পৃথক বৃত্তের আওয়াজ আসে বটে, কিন্তু এসব যে খুব সচেতন অভিপ্রায়ে সৃষ্ট ততটা মনে হয় না। সুধীন্দ্রনাথ যাই বলুন, 'বর্ষশেষ' কবিতায় উপান্ত্য স্তবকের আকস্মিক হ্রস্বমাত্রিক পঙ্‌ক্তিটি সাহসের পরিচয় নয়, অনবধানেরই নামান্তর। তেমনি, এই দুর্লভ বিরলতার জন্যে, উপরোক্ত রচনাটিকেও আকস্মিক অবচেতনজাত বলে মনে করাই সংগত, অভিপ্রেত হলে তার বহুলতর প্রয়োগ হয়তো আমরা দেখতে পেতুম।

একদিক থেকে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। সুমিতির সাধনা তাঁর মজ্জায় এমনই মিশে আছে যে এ-রকম ভঙ্গ এবং বিষম ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রশ্রয় খুব বেশি পাবে না বলেই অনুমান করি। আজ তাই একথা হয়তো বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ফ্রী ভার্সের উদাহরণ তেমন নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ঐ পথে উৎসাহী কোনো কবি কি রবীন্দ্রনাথ থেকে কোনো নির্দেশই পান না? রবীন্দ্র-রচনার কোনো দিকেই কি আমরা দেখতে পাই না মুক্তছন্দের কোনো সম্ভাব্য আদর্শ?

তখন অনিবার্যভাবে মনে পড়ে রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাস। গান সুরের অপেক্ষা রাখে বলে তার পাঠের প্রতিক্রিয়া সুরের অনুষঙ্গে বিচার্য একথা ঠিক। এ-ও আমরা জানি, নিছক গাণিতিক বিচারে অনেক সময়ে বৈষ্ণব পদও ভেঙে পড়ে, সুরের অপেক্ষা ছিল বলে পাঠের স্বাধীনতা কবিরা পুরো মাত্রাতেই নিতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে রবীন্দ্র-পূর্ব বাঙলা গান মোটের ওপর পাঠ্যছন্দের আয়ত্তগম্য। স্বাধীনতম বৈষ্ণব কবিতাও ছান্দসিকের প্রতিষ্ঠিত সূত্রাবলির সাহায্যে বিশ্লেষণযোগ্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, যেমন অন্যত্র তেমনি এইখানেও, পূর্বনির্দেশের বন্ধন থেকে খোলা প্রজাপতির মতো বেরিয়ে আসেন, উল্লসিত মুক্তির

আনন্দে কৈশোরের অবসানেই গানের ছন্দে আনেন ইচ্ছাচার। 'একটি মেয়ে একেলা/সাঁঝের বেলা/মাঠের পথে চলেছে/চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে'—'ছবি ও গান'-এর এই কবিতা এবং আরো কয়েকটি রচনায় যেমন ছন্দ খানিকটা অসংবৃত, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' জাতীয় গীতিনাট্য-গুলিতে তেমনি এই স্বাধীন সঞ্চরণের চিহ্ন দেখতে পাই বহুক্ষেত্রে। কিন্তু সে হয়তো মুক্তি নয়, হয়তো ভাঙন মাত্র। কেননা যে বন্ধনাবলি ঠিক মতো তৈরিই হলো না এখনো, তার থেকে মুক্তিরও প্রশ্ন নেই কোনো। কিন্তু আর-একটু এগিয়ে এসে এইসব গানেও কি পাই না সেই আভাস যাকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বলাই সংগত :

১ কোথায় তুমি আমি কোথায়,
জীবন কোন্ পথে চলিছে নাহি জানি।
নিশিদিন হেনভাবে আর কতকাল যবে,
দীননাথ, পদতলে লহো টানি ॥

২. অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥

৩. ওগো শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।
কুঞ্জবনে এসো একা, নয়নে অশ্রু দিক দেখা—
অরুণ রাগে হোক রঞ্জিত বিকশিত বেদনার মঞ্জরী ॥

এবং শেষ পর্যন্ত কবির অন্তিম রচনাবলিতে—তাঁর নৃত্যনাট্যে—এমন সব রচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যাকে মুক্তি না বলা অসম্ভব, এমনই বহুল তার চর্চা, অমিতাচার সত্ত্বেও তার ভিতরকার পদ্যস্পন্দ এতই প্রত্যক্ষগোচর :

১. তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর—
মোব অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ নিজ 'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ।

('শ্যামা')

২. পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী
কোথা তারে ধরি—কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না, রক্ষা রবে না।

('শ্যামা')

৩. তোমার প্রেমের বীর্যে
তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।
তব মরণের ডোরে বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে
অসীম পাপে অনন্ত শাপে।

('শ্যামা')

৪. নিবিড় রাত্রে এসে পৌঁছবে পান্থ,
বুকের জ্বাল দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে, ও সে আসবে।

('চণ্ডালিকা')

এসব উদাহরণের পাশাপাশি মনে পড়ে এর ঈষৎ পূর্ববর্তী তাঁর সেই প্রাকৃতের অনুবাদ : 'বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে'।

কবিতায় যাকে তিনি আনতে পারেননি, গানের মধ্যে সেই মুক্তিকে গোপনে গোপনে এগিয়ে নিয়েছেন অনেক দূর—এই কথা বারে বারেই মনে হয় এই দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করলে। এ-রকম দ্বিচারিতা তাঁর জীবনে যে একেবারে ব্যতিক্রম তাও নয়, প্রসঙ্গত মনে করতে পারি অল্প বয়সে তাঁর চলতি গদ্য রচনার পাশাপাশি প্রকাশ্য সাধু চর্চার কথা। যে-ক্ষমতা তাঁর অন্তর্লীন, তাকে বহির্জগতে প্রকাশ করতে সব সময়ে হয়তো তিনি রাজি হননি। 'স্ফুলিঙ্গ'র আকস্মিক উড়ন্তগুলিতে

তা কি সহসা অবচেতন ভেদ করে বেরিয়ে এল ?[৬]

অপরাজিতা ফুটিল
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে ।

অথবা

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে ।

৪

সমর সেনের এইসব কবিতায় দেখেছি পুরো মুক্তছন্দের দোলা :

১. এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কী করে আসবে বাটে,
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে
বেতারে শুনে পরাণ ফাটে ।

২. অচেতন শূন্য অন্ধকারে
বিবেকদংশন কত দুঃস্বপ্ন রচে,

৬ অবশ্য, বুদ্ধদেব-নির্বাচিত এই অংশ দুটি ঠিক-ঠিক মুক্তছন্দের নিদর্শন নাও হতে পারে। 'ফুটিল অপরাজিতা' অথবা 'পেয়েছে লিপিকা যেন' লিখলে প্রথম কবিতা স্বাভাবিক ভাবেই পড়া যেত। অর্থাৎ ওখানে যে স্বাধীনতা আছে তা পর্বের নয়, উপপর্বের।

দ্বিতীয়টিকে বুদ্ধদেব স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ বলেন। ঐ রচনায় দুটি চরণ গণ্য করলে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে হবে। কিন্তু তিন চরণে পড়লে, অর্থাৎ তৃতীয় ছত্রটিকে তিন পর্বে ভাঙলে, ওখানে পুরো স্বরবৃত্তের তাল পাই।

জীবনের শেষপ্রান্তে করাল শূন্যের পারে
আবার প্রথম গলিত শবের সান্নিধ্যে মুখোমুখি দাঁড়াই।

এবং প্রায় অনুরূপ চেষ্টা অনেক সময় অমিয় চক্রবর্তীর লেখাতেও দেখতে পাই আমরা। এটা মনে রেখেও বলা যায়, বাঙলা কবিতায় ফ্রী ভার্সের চর্চা হয়েছে অল্পই। রবীন্দ্রনাথ থেকে স্পষ্ট কোনো আদর্শ না পাওয়া কি এর অন্যতম কারণ? একই কবিতায় একই শব্দকে ভিন্ন মাত্রামূল্যে ব্যবহার করার মুক্ত সুযোগ তরুণ কবিরা আজকাল নিচ্ছেন বটে, কিন্তু তার সর্বত্র নেই কোনো সচেতন পরিকল্পনা, অনেক সময়ে আছে কেবল অমনোযোগ। এর সচেতন চেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু এর বেশি অন্য কোনো মুক্তির সন্ধানে কবিরা কি আজ উৎসাহ বোধ করবেন? প্রেরণা হিসেবে তাহলে তিনি হয়তো মনে রাখতে পারেন পুরোনো কিছু আদর্শ, মুক্তছন্দের এই অল্প কিছু দৃষ্টান্ত, এবং তখন, একদিকে যেমন সত্যেন্দ্রনাথের কোনো কোনো সংস্কৃত ছন্দের অসমতল চেহারা তাঁর মনে পড়তে পারে অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান', তেমনি তিনি তাঁর নিবিষ্ট লক্ষ্যে আনতে পারেন রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের ছন্দ—তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে যার শেষ বিকাশ।

১৯৬১

স্বাভাবিক ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ

প্রায় আশি বছর আগে এক বাঙালি যুবকের মনে হয়েছিল, 'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাঙলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী' হবে। তাঁর এই ভবিষ্যবাণী সফল হয়নি, যদিও পরবর্তী ষাট বছর তিনি নিজেই ছিলেন এই ভাষার অপ্রতিহত জাদুকর, ভাষার সমস্ত সম্ভাব্য রূপ ও শক্তি আবিষ্কারের চেষ্টায় তাঁর দীর্ঘ জীবন কখনো অবসন্ন হলো না।

ভবিষ্যবাণী সফল হয়নি, তার মানে এই যে আজও[১] কবিতার কোনো পত্রিকায় প্রায় সব রচনাতেই দেখব অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার, নগণ্য একটা অংশে হয়তো অন্য ছন্দের চর্চা। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে, বিশেষত উচ্চারণ ও বাক্-রীতির স্বভাবভঙ্গিকে বাঙলা ছন্দ যে আর আয়ত্ত করতে চায়নি, একথা নিশ্চয় সত্যি নয়। বরং আধুনিক কবি-সমাজের কোনো কোনো পুরোধা কেবল গদ্যপদ্যের সমন্বয়কেই তাঁদের একটা বড়ো ব্রত বলে জানেন। তবে কি ঐ যুবকের—যুবক রবীন্দ্রনাথের—মূল বক্তব্য ছিল ভ্রান্ত? স্বাভাবিক দিকে ছন্দের গতি কি তবে অনিবার্য ভাবে স্বরবৃত্তে পৌঁছয় না? এমন-কী উপরোক্ত কবিনেতারাও কেন তুষ্ট থাকেন কেবল অক্ষরবৃত্তের গূঢ় শক্তি আবিষ্কারে এবং নিতান্ত অমনোযোগ দেখান লৌকিক এই ছন্দটির প্রতি?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কথার দায়িত্ব যে পরে একেবারেই নেননি এমন নয়, বরং তাঁর দৃঢ়মনস্কতার একটা দিক নিবদ্ধ ছিল অবজ্ঞাত কোণ থেকে এই ছন্দ-রূপটির উদ্ধারণে, এর সংগঠনে। রামপ্রসাদ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরবর্তী জীবনে প্রচুর ছড়ানো

১ এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ১৯৬১ সালে। কবিতাজগতের চেহারা তারপর অনেকটা পালটেছে। স্বরবৃত্ত এখন একটা বড়ো রেওয়াজ।

নেই, কিন্তু ছড়া আর বাউল গানের সঙ্গে তাঁর নিবিষ্ট যোগের কথা আমরা প্রায় প্রবাদের মতো জানি। হতে পারে যে ঐ সব রচনাই তাঁকে এমন গভীরভাবে মজিয়েছিল যার থেকে তাঁর সৃষ্টিতে গৃহীত হলো এই ছন্দ এবং তাকে দেওয়া হলো এমন এক শালীন মর্যাদা যা ইতিপূর্বে সে পায়নি। অর্থাৎ লৌকিক জগৎ থেকে সচেতন সাহিত্য-জগতে এনে ছড়ার এই প্রতিষ্ঠা, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি।

তাঁর আগে এই ছন্দের ব্যবহার ছিল খানিকটা হেলাফেলায়। একদিকে যেমন এর প্রচলন ছিল অল্প, অন্যদিকে এমন-কী রবীন্দ্রনাথও একে ব্যবহার করছিলেন নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রয়োজনে, কবিতার ভাব যখন লঘু। বালকবয়সেই যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'ম্যাকবেথ'-এর ডাকিনীদের ভাষাস্পন্দে স্বতন্ত্র লয় থাকা উচিত, তা কেবল তাঁর মতো প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ডাকিনী বা দস্যু, বিদূষক বা শিকারীর কথার জন্যই পৃথকভাবে ছড়ার ব্যবহার কেন? এই ব্যবহারই বিশেষ করে বুঝিয়ে দেয়, কী তিনি ভাবছেন এই ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে। অর্থাৎ ছড়ার ছন্দ তখনও পর্যন্ত ঈশ্বরগুপ্তীয় চিহ্ন শরীরে বাঁচিয়ে রেখেছে, গুরু কিংবা গম্ভীর রচনায় তার প্রবেশ তখনও সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কেবল অভ্যাসের মোহ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেরুল তাঁর 'সিন্ধুদূত'-এর সমালোচনা, যেখানে ঘোষিত হলো: 'ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়' এবং 'এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছে বসি সাগরের তীরে' নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই দীর্ঘপঙ্‌ক্তিক অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারে তিনি খুঁজে পেলেন না ভাষা ও ছন্দ-স্বভাবের যোগ্য পরিণয়। পরিণামে লিখলেন তাঁর আপাত-যুগান্তক সিদ্ধান্ত: 'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাঙলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।'

অথচ যখন ভাবি যে এই প্রবন্ধরচনার সমকালে প্রকাশিত হয়ে গেছে 'সন্ধ্যাসংগীত' বা 'প্রভাতসংগীত', এবং 'ছবি ও গান'ও প্রায় প্রকাশের মুখে, তখন ঈষৎ বিস্ময় বোধ হয়। যখন তিনি গৈরিশ ছন্দকে আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিনন্দন জানান, তখন তা খুব সংগত লাগে এই কারণে যে তাঁর কৈশোরক রচনাবলিতেই ভাঙা-ভাঙা সেই ছন্দসাধনার পরিচয় আমরা পেয়েছি যার পরিণত রূপের নাম মুক্তবন্ধ। কিন্তু 'ছবি ও গান' পর্যন্ত ইতস্তত কয়েকটি কবিতার অস্তিত্ব সত্ত্বেও, একথা কখনোই মনে হয় না যে কবির শিল্পদৃষ্টির বিশেষ কোনো আকর্ষণ আছে বাঙলার এই স্বাভাবিক ছন্দটির প্রতি, সমালোচক হিসেবে যার বিষয়ে এত তিনি উৎসাহী।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচক-দৃষ্টি আর কবি-দৃষ্টি এক বিন্দুতে এসে মিলল আরো অনেক পরে, 'ক্ষণিকা' রচনার কালে। এর মধ্যে কেটে গেছে পনেরো বছরের বেশি। 'ক্ষণিকা'তে কবির ব্যবহার দ্বিধা-হীন, যেন একটা বড়ো রাজ্য-জয় সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন দৃষ্টি অন্য রাজ্যে —এবং তাকে তিনি অধিকার করেও নিলেন মহিমান্বিত সম্রাটের মতো, 'নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে তুচ্ছ কথা'। তাঁর হাতে তুচ্ছ পেল অতুচ্ছের সম্মান, 'গভীর সুরে গভীর কথা' এখন আর তিনি বলেন না বটে, কিন্তু ঈষৎ অনুকম্পায়ী কি দেখতে পান না স্বচ্ছ জলের নীল তলে তাঁর 'আপন ব্যথার নিজের কথা'?

হয়তো তবুও এ সন্দেহ থেকে যায় যে বাইরে একটু চপল চলন ছিল বলেই 'ক্ষণিকা'তে সম্ভব হলো ছড়ার ছন্দের ব্যবহার, তার দ্বারা যদিও প্রমাণ হলো যে এ ছন্দে সুন্দর সাহিত্যিক রচনা সম্ভব, তবু কি সঙ্গে সঙ্গে এও ধরা পড়ল না যে ছন্দে জাতিবিচার মানতে হয়, ছড়ার ছন্দে সম্ভব নয় গভীর কথা বলা?

কিন্তু কাকে বলে গভীর কথা? অবিশ্বাসী যখন 'ক্ষণিকা'তে তা দেখতে পান না, তখন অবশেষে 'খেয়া'তে নেমে আসে বিশ্বাসের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, দেখতে পাই লৌকিক ছন্দের আকর্ষণে কেমন করে এসে

দাঁড়ায় অলৌকিক পৃথিবী, রচিত হয় এক ঘুমের দেশ। এর মধ্যে একবার তিনি 'শিশু'র জগৎ ঘুরে এসেছেন ঐ বাহনে এবং 'উৎসর্গ'রও একটা অংশ ছড়া। এ-দুটি বইয়ের মধ্যবর্তিতা শুধু যে তাঁর প্রত্যয় বাড়িয়েছে তা নয়, ছন্দের শক্তি আবিষ্কারেও এখন তিনি অনেক দূর অগ্রসর। যাকে আমরা ভাবতাম কেবল গানের ছন্দ, বা লঘুতার, এইখানে এসে দেখি একদিকে তা যেমন স্নিগ্ধ ভাবাবহ নির্মাণে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি সবল শক্তির ঘোষণাতেও তার আর দ্বিধা নেই। একদিকে যেমন এ ছন্দে সুমিত মুক্তদলের ব্যবহারে কবি তাকে দেখতে পান 'ঘরেও নহে পারেও নহে, যে-জন আছে মাঝখানে'—তেমনি অন্যদিকে 'তীব্র তড়িৎ হাসি হেসে বজ্রভেরীর স্বরে' জগতের 'শক্তি-মূর্তি'র কথাও তিনি বলতে পারেন ছড়ানো-ছিটোনো রুদ্ধদলের বহুল প্রয়োগে।

যেন এই ছন্দের একূল-ওকূল পাড়ি দিয়ে নিলেন 'খেয়া'য়, তারপর তাঁর গানের জগতের অবসানে 'বলাকা'য় এল মুক্তির আহ্বান। এই আহ্বান, যেমন অক্ষরবৃত্তের তেমনি এই ছড়ার, মুক্তি আনল শুধু বাইরের অর্থে, পঙ্‌ক্তিবন্ধনের মুক্তি—প্রবাহকে হয়তো আর-একটু প্রখর করা হলো, এই মাত্র। কিন্তু 'পলাতকা'য় এই প্রাকৃত ছন্দের সমিল মুক্তবন্ধ এবং 'পরিশেষ'-এ (পরে 'পুনশ্চ'-তে) তার অমিল মুক্তবন্ধ রূপের পর—বা, তার আগে—এই ছন্দে আমরা এমন কিছু দেখি না যাকে বলা চলে বাস্তবিক আবিষ্কার, ছন্দের অন্তর্গত কোনো পরিণতি বা পরিবর্তন। এ-পর্যন্ত কবি যা করেছেন তা নিশ্চয় এক জীবনের পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি। কিন্তু সেই যথেষ্টতে যখন তিনি নিজেই তৃপ্ত থাকেন না, উৎসুক হন আরো মুক্তির খোঁজে, তাঁকে আসতে হয় গদ্যকবিতা পর্যন্ত—তখন প্রশ্ন ওঠে যে এই জগতের শেষ তাঁর দেখা হয়েছিল কি না, প্রথম যৌবনে যে ধারণা তিনি জানিয়ে-ছিলেন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছিল কি না। অর্থাৎ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙলার অনেকখানি ছন্দোমুক্তি ঘটিয়েও এই প্রাকৃত

ছন্দটিকে তার সমস্ত সম্ভাব্য মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন কি? 'ছড়ার ছবি'তে এসে কিন্তু মনে হয় মুক্তিসন্ধানে এখন তিনি আর উৎসাহী নন, সচেতন মনের চাপকে খুলে দিয়েছেন একটুখানি, ফলে সাবেককেলে শিশুকে নিয়ে সাবেককেলে ছন্দে এলেন ফিরে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, দীর্ঘ জীবনের অবসানেও কবি তাঁর গূঢ়তম বাণীর জন্য নির্ভর করতে পারলেন না সেই ছন্দের ওপর, যাকে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল বাঙলার স্বাভাবিক ছন্দ। তাই 'ছড়ার ছবি'র উলটো পিঠে 'প্রান্তিক' এবং জীবনের প্রান্তে রইল 'শেষ লেখা'; এই দুয়েরই বাহন অক্ষরবৃত্ত, যদিও পৃথক স্পন্দ। ফলে আধুনিক কালের কোনো কবি যখন বলেন 'বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন' (অক্ষরবৃত্ত অর্থেই 'পয়ার' লিখছেন বুদ্ধদেব), তখন সেকথা একরকম প্রমাণিত সত্য বলেই আমরা মেনে নিই।

২

বস্তুতই প্রমাণিত সত্য। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই, বিদ্রোহেরও আভাস নেই। এক হিসেবে দীর্ঘকালের মধ্যযুগীয় কাব্যে অক্ষরবৃত্ত যে এত বড়ো মর্যাদা পেয়েছে তারও একটা কারণ এর 'অফুরন্ত সংকোচন সম্প্রসারণশীলতা', যাকে স্বভাবের অনুকূল বলে গণ্য করা যায়। অনেক ভার, এমন-কী 'চৈতন্যচরিতামৃত'র মতো জটিল দার্শনিকতার ভারও সে অনায়াসে সহ্য করে। স্বভাবের সম্মতি না থাকলে এ কখনোই সম্ভব হতো না।

হতে পারে যে সর্বত্র সেসব রচনা কাব্য হয়নি। কবি যখন স্বাভাবিকতা বা গদ্যটান সৃষ্টি করতে চান, তখন কথাবলার সেই স্পন্দকে তিনি আয়ত্ত করেন ছন্দের প্রবাহের মধ্যেই। কিন্তু মধ্যযুগের রচনাবলি এই প্রবাহের আবিষ্কার শেখেনি, তাই গদ্যপদ্যের নৈকট্য তাকে করে তুলেছে অনেকটা প্রোজেইক। মধুসূদনের ছন্দ-চর্চা

সেই কারণেই বৈপ্লবিক। অক্ষরবৃত্তের এই সর্ববাহী শক্তি যখন তাঁর হাতে এক অর্গলহীন প্রবাহ পেল, তখন থেকে এ-ছন্দের প্রভাব হলো সর্বগ্রাসী, ছন্দের ক্ষেত্রে প্রায় একেশ্বর।

অল্পবয়সের মাইকেলবিমুখতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই সব অর্থেই উপকারী ছিল। কেননা এই সর্বগ্রাসী অক্ষরবৃত্তের বাইরে অন্য কোনো ছন্দ-রূপ তাঁকে আবিষ্কার করতে হতো অন্তত আত্মরক্ষারও প্রেরণায়। ঐ প্রেরণার দূরবর্তী এক ফল দেখতে পাব তাঁর মাত্রাবৃত্তের রহস্য-আবিষ্কারে, আর—জানি না—হয়তো প্রাকৃত বাংলার প্রতি তাঁর আগ্রহের এই আতিশয্যও এরই এক গূঢ় প্রতিক্রিয়ায়। অবশ্য অক্ষরবৃত্তও তিনি ছাড়েননি, কেনই-বা ছাড়বেন। বরং মধুসূদনের পরেও ঐ ছন্দ থেকে ক্রমে তিনি আরো শক্তি নিংড়ে নিতে লাগলেন, তৈরি হলো প্রবহমান পয়ারের অবলীলা। মধুসূদনের ছন্দও—কখনো সংস্কৃতপন্থার আতিশয্যে, কখনো বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে—স্বাভাবিক বাক্‌রীতিকে সর্বাঙ্গীণ আয়ত্ত করতে পারেনি।

শব্দের দুরূহতা আর অন্বয়ক্লিষ্টতা অনেক সময়েই বাক্‌স্পন্দ সঞ্চারের বাধা হয়ে ওঠে। এই বাধা রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সরাতে চান। ফলে 'মানসী' পর্যন্ত পৌঁছেই তাঁর অক্ষরবৃত্ত এক বেগবান্ প্রবাহ অর্জন করল। এই ছন্দে যখন কোনো কাহিনী লেখেন কবি, কিংবা নাটক, তখন তা একদিকে যেমন কবিতার মহিমময় সৌন্দর্য পায়, অন্যদিকে তেমনি তুলে আনে লোকভাষার জীবন্ত স্পন্দন। 'দেবতার গ্রাস' বা 'গান্ধারীর আবেদন' এর ভালো উদাহরণ।

এই ধরনের কাহিনী বা নাটকে যা ছিল না, সে হলো চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ। কবিতার মধ্যে অল্প একটু এগিয়ে এসে আমরা প্রায় ভুলেই যাই যে দুর্যোধন 'সুখী নই' বলে না, বলে 'সুখী নহি' কিংবা 'আজ'-এর পরিবর্তে 'অদ্য':

সুখী নহি তাত
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে

একত্র আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।

কিংবা—

রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন পরে বহুদূরে তার
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার।

এই ভাষাকে আমরা ততটাই সাধু ভাবতে পারি যতটা সাধু 'জীবনস্মৃতি' বা 'চতুরঙ্গ'র ভাষা। 'চতুরঙ্গ'তে যেমন সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার সত্ত্বেও তার স্পন্দটা মূলত চলিতের—অক্ষরবৃত্তের এসব ব্যবহারেও ভাষার প্রায় ততটাই স্বাভাবিকতা আমরা বুঝতে পারি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইখানে থামেন না। 'স্বাভাবিক দিকে ভাষার গতি' অর্থে তিনি যে চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগকেই বোঝেন, অ্যাণ্ডার্সনের কাছে লেখা চিঠিতে তা জানা যায়। 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে' লাইনটির রূপ সাধু ছন্দে কী হতে পারে, তা জানাবার জন্য অ্যাণ্ডার্সনকে লিখেছিলেন তিনি: 'যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে'। কিন্তু ক্রিয়াপদের চলিত রূপ—যেমন গদ্যে তেমন পদ্যে—যেন ঈষৎ দ্বিধান্বিত ছিল আমাদের সাহিত্যে, 'সবুজপত্র'র আগে পদ্যেও তার খুব নির্ভীক প্রকাশ ছিল না।

একেবারে যে ব্যবহার ছিল না, তা অবশ্য নয়। ছড়ায় বাউলে রামপ্রসাদে আছে এই ভাষা, রবীন্দ্ররচনাতেও আছে 'সবুজপত্র'র আগেই। তবে প্রথমোক্ত লেখাগুলি কিছু-বা অবজ্ঞাত ছিল, আর রবীন্দ্রনাথেও তেমনি লঘুতা বা অলৌকিকতার দুই বিপরীত মেরুতে

তার বসবাস। ঠিক এই কারণেই কবিকে সাধু আর অসাধু ছন্দের ভেদ কল্পনা করতে হয়েছে ভাষাভেদ অনুসারে। অল্পবয়সের চলিত গদ্যরচনার সঙ্গে ভবিষ্যতের বাংলা ছন্দের এই স্বভাব-অনুগামী হবার স্বপ্ন মিলিয়ে দেখলে আমরা বুঝি যে চলিত রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল আবাল্য, প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই তাঁর মন তৈরি ছিল এর জন্য। সন্দেহ নেই যে 'সবুজপত্র'র যুগ তাকে অনেক বেশি পরিবেশগত প্রশ্রয় দিয়েছে। ফলে, একসময়ে যাকে বলা হতো তরল ছন্দ বা লঘুভাবের বাহক—'সবুজপত্র'র পর তারই প্রয়োগে দেখা দিল দীর্ঘপঙ্‌ক্তির কবিতা 'যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো/আপন হিয়ার পরশ দিয়ে'—সেখানে শোনা গেল অক্ষরবৃত্তেরই স্পন্দন, যদিও তার ছন্দ ছড়ার।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর ছন্দ ওর স্পন্দনে মেলাবার এই সুন্দর সম্ভাবনা খুব বেশি আর তাঁর কাজে লাগল না। এই ভেদও তিনি অন্যায়রকম মনে রাখলেন যে অক্ষরবৃত্তে চলতে পারে কেবল সাধু ক্রিয়াপদ, আর চলিতের জন্য চাই ছড়ার ছন্দ।

পুরোনো অভ্যাসই অবশ্য এর একমাত্র কারণ নয়। প্রথম থেকেই কবি সচেতন যে সাধু ও চলিত ভাষায় মূল প্রভেদ হস্‌-ধ্বনির ব্যবহারে। অক্ষরবৃত্তের প্রাচীন একটি দুর্বলতা এই যে এখানে 'হসন্ত শব্দকে আমরা আমল দিই না।' তার মানে 'চলছি' কথাটি অক্ষরবৃত্তে তিন মাত্রার মূল্য পায়, আমাদের দৈনন্দিন উচ্চারণে তার মাত্রা বস্তুত দুই। 'সিন্ধুদূত'-এর সমালোচনায় কবি এতদূর দেখিয়েছিলেন যে 'মন বেচারির কী দোষ আছে' এর উচ্চারণ অনুযায়ী লিপি হওয়া উচিত 'মন্বেচারিকী দোষাছে'।

উচ্চারণের এই স্বাভাবিকতা না থাকলে অক্ষরবৃত্তে চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ ক্লান্ত বা কৃত্রিম শোনাতে পারে, এ আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের ছিল হয়তো। সেইজন্য মৃত্যুকাল পর্যন্ত কবি তাঁর অক্ষরবৃত্তে এই ধরনের ক্রিয়াপদ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেননি। শেষ কবিতার ছলনাময়ীকে যদিও বলেছিলেন 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' বা 'মিথ্যা

বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 'তাহার গৌরব' 'কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে' বা 'ছলনা সহিতে'র মতো প্রয়োগও তো দেখতে পাচ্ছি। কেবল শেষ কবিতায় নয়, সাধু এবং চলিত ক্রিয়ার এই সম্মেলন তাঁর রচনায় অনেকদিন ধরেই চলছে। একে নিছক চলিত ব্যবহার আমরা কখনোই বলব না, এবং এর একটা দিশারি সূত্রও নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাব। সেইসমস্ত চলিত ক্রিয়া তিনি প্রথম থেকেই মেনে নিতে অভ্যস্ত যার পুরোটাই স্বরসমন্বিত, যা হসন্ত-মধ্য নয়। 'অনায়াসে যে পেরেছে' একথা যিনি অনায়াসে লেখেন অক্ষরবৃত্তে, ঠিক তারই সঙ্গে কেন তিনি বলেন 'ছলনা সহিতে'? কেননা এই শেষ ক্রিয়াপদটির চল্‌তি চেহারা 'সইতে'র মধ্যবর্তী অংশটা এমন নেমে যায় যে তাঁকে পুরো মাত্রামূল্য দেওয়া সংগত নয় বলে কবি সহজেই বুঝতে পারেন। অথচ তাকে দু'মাত্রায় আনবার সুযোগও তাঁর কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। প্রথম যুগের কবিতাতেও ঠিক ঐ একই চেতনায় তিনি 'ফেলে দিয়ো ফুল'-এর সঙ্গে সঙ্গেই লিখতে চান 'মরিতে চাহি না আমি'।

কিন্তু ছোটো একটি সময় এসেছিল যখন রবীন্দ্ররচনায় পূর্ণাঙ্গ চলিত রীতি দেখা গেছে অক্ষরবৃত্তের আয়তনেই। মনে করা যাক 'পরিশেষ'-এর সেই অল্প কয়েকটি কবিতা, যার অনেকটাই পরে পাই 'পুনশ্চ'তে: 'পত্রলেখা' বা 'বাঁশি'র মতো কবিতা। 'বাঁশি'তে যেমন তিনি একটা অজানিত দুঃসাহস করেছেন 'আকবর বাদশার সঙ্গে' পদটির অষ্টমাত্রিক ব্যবহারে, (অজানিত—কেননা এর সচেতন বহুল প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ অল্পই করেন, একটা রুদ্ধ দুয়ার তাই তাঁর হাতে খুলতে খুলতেও খুলল না, 'পরিশেষ'-এ সম্ভব হলো না 'মানসী'র মতো আর একটা ছন্দ-বিপ্লব),—অন্যদিকে তেমনি এখানেই পাই এমনসব টুকরো: 'লিখতে বসেছি চিঠি' 'মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি কুঁকড়ে গিয়েছে', 'যাই তাকে খাইয়ে আসি গে'।

প্রবোধচন্দ্র আশ্চর্য বোধ করেন এই দেখে যে অন্য কোনো কাব্যে ও-রকম প্রয়োগ নেই। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কী? 'পরিশেষ'-এর আগে

যে নেই সে তো স্বাভাবিক। কেননা তখনো পর্যন্ত তিনি অক্ষরবৃত্তে সম্পূর্ণ চলিত প্রয়োগে অভ্যস্ত নন; কিন্তু 'পরিশেষ'-এর পরেও যে নেই তার একটা অন্য তাৎপর্য কি আমরা ধরতে পারি না? 'পরিশেষ'-এর উল্লিখিত প্রয়োগগুলির একটা অসংগতি কবিকে পীড়িত করছিল বলে বিশ্বাস হয়, কেননা যে-মাত্রায় ওই শব্দগুলিকে রাখা আছে সেভাবে পড়তে গেলে উচ্চারণে একটা কৃত্রিমতা অনিবার্য, আবার উচ্চারণের স্বভাব ঠিক থাকলে ওইসব অংশে ছন্দ এলিয়ে পড়ে। 'লিখতে বসেছি চিঠি' 'উঠত না শঙ্খধ্বনি' 'লেখা করলেন শুরু': এদের আট মাত্রার মর্যাদা দিলে লি, উ বা ক-এর উপর এমন একটা টান এসে পড়ে যাতে পরবর্তী অংশ খুব শিথিল শোনায়। ঠিক সেইরকম 'ঘরেতে এল না সে তো' 'দেয়ালেতে মাঝে মাঝে' 'শেয়ালদা ইস্টিশানে'-এর চিহ্নিত অক্ষরগুলিকে আনতে হচ্ছে নিতান্তই ছন্দ-রক্ষার তাগিদে। বস্তুত, শ্রুতিগত এই দুই পীড়াজনক অসংগতি বর্জন করে ভাষার স্বাভাবিক ধরনকে সম্পূর্ণ করবার পরবর্তী প্রেরণাতেই 'পুনশ্চ'র জন্ম সম্ভব হলো। গদ্যছন্দ সৃষ্টির অন্যতম আরো অনেক কারণকে অগ্রাহ্য না করেও বলা উচিত যে 'পরিশেষ'-এর দুর্বলতাগুলি মুছে নেবার এক উলটো চেষ্টা থেকে এল 'পুনশ্চ'র কবিতা, যার পর থেকে হসন্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়ার ব্যবহার কবিকে অনিবার্য ভাবে টেনে নিয়েছে গদ্যছন্দের দিকে।

উলটো চেষ্টা বলছি এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালেই এই সমস্যা থেকে বেরুবার আর-একটা পথ তৈরি হচ্ছিল তরুণ কবিদের লেখায়। 'পদাতিক'-এর কবিকিশোর অক্ষরবৃত্তে যে বিপ্লব ঘটালেন, অল্প আগে বুদ্ধদেব বসুর রচনাতেও দেখা দিয়েছে তার ঈষৎ আভাস। এই বিপ্লবের ফলে আমরা জানলাম যে এ-ছন্দে হসন্তমধ্য শব্দকে ইচ্ছে করলেই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে নিয়ে আসতে পারি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় 'কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরুখোঁজা করে'-র পরের লাইন অনায়াসে হলো 'অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে'—ইচ্ছে করলে যাকে লেখা যায় 'অনেগ্দিন খিদ্দিপুর্‌র ডকের অঞ্চলে' এই চেহারায়।

অনেকদিন বা খিদিরপুর এখানে পেল চার মাত্রার জায়গা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই আয়োজন যে ছন্দ-তত্ত্বের নিবিড় অধ্যবসায়ের ফল, এমন নয়। তাঁর নির্ভর ছিল তাঁর কান, তাঁর আদর্শ ছিল সাধারণের মুখের ভাষা। অন্যপক্ষে, তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ জানতেন আধুনিক অক্ষরবৃত্তে এই হওয়া উচিত হস্-ধ্বনি বা রুদ্ধদলের প্রাপ্য, অথচ তাঁর রচনায় এর সজ্ঞান প্রয়োগ নিতান্তই কম। 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত' লিখে যে নীরেন রায় কিছুমাত্র অপরাধ করেননি, দিলীপকুমারকে কবি তা সুন্দর বুঝিয়েছেন। কিন্তু ঐ 'একটি'কে অক্ষর-বৃত্তে তিনি নিজে প্রায় কখনোই তু'মাত্রায় ব্যবহার করতে চান না, এও সত্যি। ছন্দ ব্যাখ্যানের সময়ে এই ব্যবহারের নিদর্শন হিসেবে যখন তিনি লেখেন :

একটি কথা শোনো, মনে খটকা নাহি রেখে,
টাটকা মাছ জুটল না তো, শুঁটকি দেখো চেখে।

তখন সেই রচনায় কি স্বরবৃত্তের তালটাই বড়ো হয়ে ওঠে না? অক্ষর-বৃত্তের উদাহরণ হিসেবে এটি বা এর পূর্ববর্তী 'একটি কথা শুনিবারে তিনটি রাত্রি মাটি' খুব যে ভালো আদর্শ নয় তা স্বীকার করতে হবে।

রবীন্দ্রপরবর্তীদের পক্ষে ছড়ার ছন্দের আকর্ষণ যে আর বেশি রইল না তার কারণ এখন বোঝা যায়। চল্‌তি ভাষার প্রয়োগ আর বাক্‌স্পন্দের সৃষ্টিতে তাঁদের সংগত উৎসাহ অক্ষরবৃত্তেই যথেষ্ট প্রশ্রয় পেল। তার অনিয়মিত পদভাগের প্রবাহ এবং চলিত ক্রিয়ার যথেচ্ছ সংকোচন-প্রসারণের ফলে অনেকটাই স্বাধীনতা পেলেন এই কবিরা।

আর রবীন্দ্রনাথ, ক্রিয়াপদের এই ধরনটিকে তিনি আনলেন না অক্ষরবৃত্তে, অনেকসময়েই তিনি তুষ্ট রইলেন সাধু-চলিতের মিশ্র এক পদ্যভাষায়। আর যখন তাকে ভাঙতে চাইলেন, আনতে চাইলেন পুরোপুরি চল্‌তি রীতি, তখন—যে-কথা আগে বলেছি—তাঁর অনিবার্য টান হলো গদ্যছন্দের দিকে। অর্থাৎ একদিকে অক্ষরবৃত্তের বহনক্ষমতা, বিচিত্র বন্ধুর সুর, অর্গলহীন প্রবাহ, অন্যদিকে মৌখিক আলাপচারিজাত

গদ্যছন্দের চর্চা : এর ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথিত সেই স্বাভাবিক ছন্দটিকে তার ন্যায়সংগত পরিণামের দিকে নিতে পারলেন না, তাকে দিতে পারলেন না উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো প্রসার। এ-ছন্দ হয়ে রইল নিতান্তই গৌণ এক ছন্দ।

৩

কিন্তু কেবলই কি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন? না কি লৌকিক এই ছন্দটির ভিতরেই ছিল এমন কোনো দুর্বলতা যা বাক্‌স্পন্দের প্রতিকূল?

বাংলা ভাষার স্বভাব এই যে এর প্রতিটি শব্দের আদিতে কোনো প্রস্বর নেই, ইংরেজি বা সংস্কৃতের ধরন এর নয়, এ-ভাষায় ঝোঁক থাকে শব্দগুচ্ছে বা বাক্যাংশে। 'এখন আমরা কোথায় যাব?' এই সম্পূর্ণ বাক্যটিতে স্বভাবত একটিমাত্র ঝোঁক পড়তে পারে এবং সেটির সন্নিপাত কোন্ শব্দে তার ওপর নির্ভর করবে এ-বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ। কিন্তু যদি, ধরা যাক, লৌকিক ছন্দের অন্তর্গত করতে হয় ঐ বাক্যকে, যদি লেখা হয় 'এখন আমরা কোথায় যাব কোন্ অজানা দেশে' তাহলে বাক্যের সবটাই রইল বটে, কিন্তু ঐ স্পন্দ প্রায় কিছুই রইল না। তার কারণ, এ-লাইনটি পড়তে চারটি কৃত্রিম আঘাত লাগছে; ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গ উঠছে তার স্বাদ হচ্ছে একেবারে স্বতন্ত্র।

এই কৃত্রিম শ্বাসাঘাতজনিত ছন্দস্পন্দ নির্মাণ এবং অতিনিরূপিত বৈচিত্র্যহীন পর্বসন্নিবেশই স্বরবৃত্তের মস্ত দুর্বলতা। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লক্ষ করেছিলেন যে স্বাভাবিক ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ এইটে, কিন্তু পরিণত বয়সেও যে এর নিহিত দুর্বলতার কথা তিনি বলেননি অথবা এগিয়ে আসেননি সেই দুর্বলতা-মোচনের জন্য, এইটেই ছিল মুশকিল।

মোচনের কোনো সম্ভাব্য পথ ছিল কি?

ছেলেভুলোনো ছড়া রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও জানেন যে এই ছন্দ কখনো ভাঙা-ভাঙা, অমার্জিত, অসংস্কৃত। তাঁর

নিজেরই রচনায় অবশেষে এ-ছন্দের যে রূপ তৈরি হলো, তার প্রতিপর্বে নির্দিষ্ট হলো চারটি দল বা সিলেব্‌ল্‌। এর একটা সুবন্ধ চেহারা তিনি আনলেন, যেমন অন্যান্য ছন্দেও তিনি তৈরি করেছেন পরিমিত নিয়মের বন্ধন। ছড়ার জগৎ থেকে এ-ছন্দকে নাগরিক সাহিত্যে তুলে আনবার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে এইটেই ছিল সংগত। কিন্তু এই বন্ধটি একবার প্রস্তুত হয়ে যাবার পর এখান থেকে কবি কি আর মুক্তির সন্ধান করলেন? না।

যাকে বলা যায় তিন দল বা পাঁচ দলের পর্ব, রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তে তা ব্যবহার করেন না বলে প্রবোধচন্দ্র তৃপ্তি বোধ করেছেন। এমন-কী এও তিনি জানিয়েছেন, মধুসূদনের 'যেমন কর্ম ফলল ধর্ম বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' পদটির তৃতীয় পর্ব নিতান্ত ত্রুটিদুষ্ট, কেননা এর মাত্রাসংখ্যা পাঁচ। অথচ ছড়ায় এ-রকম পর্ব অনায়াসেই তৈরি হয়, এর দ্বারাই ছড়াকারেরা হয়তো বৈচিত্র্যের একটা আস্বাদ নিতেন। 'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো' বলতে কোন্‌ বাঙালি শিশু বিপন্ন হয়? এ ছড়াটির অনেক পর্বেই তো পাঁচ মাত্রা এবং আমরা জানি যে ঐ সন্নিবেশ এ-ছন্দের এক নিজস্ব ধর্ম।

পর্বগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল একটা সমতাই এনেছেন তা নয়, এই সমতায় আরো কয়েকটি অলিখিত নিয়ম তিনি মেনেছিলেন। সেই নিয়মের বশে একটি পর্বে চারটি রুদ্ধদল তাঁর কবিতায় অসংগত, তিনটি রুদ্ধদল এলে চতুর্থ দলের কোনো দরকারই নেই। কোনো পর্বে থাকতে পারে চারটি মুক্তদল। একটি রুদ্ধদল, তিনটি মুক্তদল; অথবা দুটি রুদ্ধদল, দুটি মুক্তদল—এই হলো সবচেয়ে প্রশস্ত ব্যবস্থা। কিন্তু এমন-কী সেখানেও এর পরম্পরায় প্রায় একটি গাণিতিক নির্দেশ যেন তিনি মানছেন। — — ⌣ ⌣ অথবা ⌣ ⌣ — — তাঁর রচনায় খুব কমই ব্যবহৃত; — ⌣ — ⌣, ⌣ — — ⌣, ⌣ — ⌣ —, — ⌣ ⌣ —এই পরম্পরাতেই তাঁর স্বস্তি। দু-একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক:

ফাগুনমাসে পূর্ণিমাতে যে নিয়মটা চলে
রাগ কোরো না চৈত্রমাসে সেটা ভঙ্গ হলে।

এই শ্লোকের প্রথম পর্বটি কি হতে পারত 'ফাল্গুনমাসে', যেখানে চারটি দলের মধ্যে প্রথম দুটিই রুদ্ধ? অথবা,

মরুপাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতলে—

এর প্রথম পর্বে কি রবীন্দ্রনাথ লিখতে চাইবেন 'মরুপর্বত', যেখানে চারটি দলের মধ্যে শেষ দুটিই রুদ্ধ? উচ্চারণ করলেই টের পাওয়া যায় যে এই দুটি ক্ষেত্রেই তাহলে ছন্দের অনায়াস মসৃণতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হতো।

অর্থাৎ রুদ্ধদল-মুক্তদলের যেসব পরম্পরা রবীন্দ্রনাথ বর্জন করতে চান, সেখানে খানিকটা শ্রুতিকটুতাই আছে। কিন্তু অনভিপ্রেত আঘাত কখনো কখনো ছন্দের পক্ষে ভালোই নয় কি? নিতান্ত পরিমিত চলনে মাঝে মাঝে কি শ্রান্ত হয় না কান?

প্রশ্ন এই যে, শ্রুতিকটু কেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন লেখেন 'অনেক বাক্য হানাহানি, গর্জনবর্ষণ অনেকখানি' তখন এর তৃতীয় পর্বের চারটি রুদ্ধদল (গর্, জন্, বর্, ষণ্) যে অনেকের কানে ক্লিষ্ট লাগবে তা সত্যি। লাগবে এইজন্যে যে প্রথম থেকেই এ-ধরনের ছন্দ আমরা একটা অতিরিক্ত ঝোঁকের সাহায্যে পড়তে অভ্যস্ত, যে ঝোঁক বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, যে-ঝোঁক শুধু পদ্যের। এর ফলে যে-রকম পর্ব তৈরি হয় তার অল্প অবসরে 'গর্জনবর্ষণ'-এর মতো অতখানি ওজন চাপানো সম্ভব নয়। দল যতই থাকুক, ধ্বনি তো ওখানে অনেক বেশি। 'হানাহানি' আর 'গর্জনবর্ষণ'কে একই সীমায় আনতে আমাদের জিব ত্রস্ত এবং শ্রান্ত বোধ করে, সেই শ্রান্তিতে অপ্রসন্ন হয় কান।

তাহলে কি ও-লাইনটিতে ছন্দদোষ ছিল? মনে হয় না। অতিরিক্ত ঝোঁকের এই পদ্ধতিকে বর্জন করে যদি স্বাভাবিক বাক্‌স্পন্দে ওকে

উচ্চারণ করি, তাহলে দেখতে পাব লাইনটির দুই অংশ : 'অনেক বাক্য হানাহানি' আর 'গর্জনবর্ষণ অনেকখানি'। তখন, এই প্রসারিত আট মাত্রার আয়তনের মধ্যে 'গর্জনবর্ষণ' অনেকটা ঠাণ্ডা জায়গা পায়, তার তাড়া কমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিকটুতা দূরে যায়। আমি অবশ্য বলছি না যে দ্বিজেন্দ্রলালের খুব-একটি নিপুণ লাইন ওটি। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের ব্যবহৃত ঐ লাইনটি দিয়েই আমি দেখাতে চাই যে এ জাতীয় পর্বের প্রয়োগই স্বরবৃত্তকে তার অভিপ্রেত মুক্তি দিতে পারত। সুবদ্ধ পর্বরূপে অভ্যস্ত থাকতে রাজি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ এর ব্যবহার একেবারেই করলেন না। এ-ছন্দে প্রতিপর্বের মাপ চারের এবং তার ওজন ছয়ের, কবির এই সিদ্ধান্ত যদিও সূক্ষ্মশ্রুতির পরিচায়ক, এই ছন্দের প্রকৃতি প্রায় পুরোই বাঁধা পড়ে ওই এক কথায়,—তবু এই সিদ্ধান্তই যে তাঁকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ওপারে যেতে দিল না, এও সত্যি।

কথা উঠতে পারে যে উপরোক্ত ওই পর্বের ধরনে এবং বিশেষত প্রস্বরের অভাবে স্বরবৃত্তের জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর থাকল কোথায়, সে তো হয়ে উঠল প্রায় অক্ষরবৃত্তেরই সগোত্র। ঠিক এই কথাই বলবার অভিপ্রায় আমার, এতক্ষণ আমি কথার এই পরিণতির দিকেই আসতে চাইছি যে বাংলা ছন্দ একটা জায়গায় অক্ষরবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের মিলন-বিন্দু খুঁজতে পারে। তার একটা সুবিধে হয়তো এই যে অক্ষরবৃত্তের সংকোচন-প্রসারণ প্রবণতাকে আরো অনেকটা এগিয়ে নেওয়া যায়, তার অধিকারে পাই যেন সমস্তটা জগৎ। 'গর্জনবর্ষণ' মাত্রাবৃত্তে আট মাত্রা, অক্ষরবৃত্তে ছ-মাত্রা, স্বরবৃত্তের নতুন এই ব্যবহারে তাকে হয়তো আনা যাবে চার মাত্রায়। তার মানে এ নয় যে ও-রকম প্রবল এক শব্দের মাত্রাপরিমাণ কমিয়ে দেওয়াটাই ছন্দরচনার একমাত্র সার্থকতা। তার মানে কেবল এই যে প্রয়োজনমতো ছোটো বড়ো সব ব্যবহারেই অভ্যস্ত হতে পারবে শব্দগুলি। মধ্যযুগীয় রচনার যেসব টুকরো অংশে ছান্দসিকেরা কবিদের ছন্দদোষের কথা বলেন, উল্লেখ করেন যে অক্ষর-

বৃত্তের মধ্যবর্তী সেই অংশ সহসা স্বরবৃত্তের দোলা দিচ্ছে—যেমন ধরা যাক কৃত্তিবাসের 'দেবগণের গতি নাই লঙ্কার নিয়ড়' বা 'দুই পাখে আগুলিলাম দুইটি প্রহর' কিংবা 'দেখিবারে আইল সবে অম্বর উপর'—সেসব উদাহরণ আসলে এটাই প্রমাণ করে যে দুই ছন্দের মধ্যে একটা সহজ যোগাযোগের সম্ভাবনা প্রথম থেকেই ছিল। বুদ্ধদেব একবার অতর্কিতে এদের এই চারিত্রিক সাদৃশ্যের কথা বলেওছিলেন, 'ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি'র মতো অনায়াস অক্ষরবৃত্ত তিনি লক্ষ করেছিলেন রাবীন্দ্রিক এক ছড়ার সূচনায়। কিন্তু এই চাবি নিয়েও গূঢ়তর কোনো রহস্য উন্মোচনের জন্য এগিয়ে আসেননি তিনি। বরং এর সুনিরূপিত মাপের কথা মনে রেখে এইটেই বলেছেন যে 'অনেক কথা আছে যা এ-ছন্দে ঢোকে না, অনেক ভাব আছে যা এ-ছন্দ বহন করতে পারে না'। গাম্ভীর্য এর প্রকৃতিগতই নয়, তাঁর এই সিদ্ধান্ত পুরোনো এবং ঈষৎ ভ্রান্ত। কিন্তু এর ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীনতার দুর্বলতা দূর করতেও তাঁর উৎসাহ হয়নি। বরং অমিয় চক্রবর্তী এই ছন্দটিকে তার সুমিত চলন থেকে মুক্তি দেবার ঈষৎ চেষ্টা করেন: 'অবগাহনের প্রতি পলক চেতনা ঢালে অচঞ্চল' বা 'প্রকাণ্ড গাছ প্রকাণ্ড বন বেরিয়ে এলেই নেই'-এর মতো ক্বচিৎ-কখনো রচনায়। কিন্তু এর দ্বারাও প্রত্যাশিত সেই মিলন আমরা পাচ্ছি না, পাচ্ছি কেবল এক অসমতল বন্ধুরতার তৃপ্তি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে তাঁরই পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-চর্চায় অক্ষরবৃত্ত-স্বরবৃত্তের এই মিলনমুহূর্ত যেন প্রায় আবিষ্কৃত হতে চলেছিল। 'আলেখ্য' বইতে সেসব ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রলাল যে পুরোই সফল ছিলেন তা হয়তো নয়, কিন্তু যোগ্যতর প্রতিভার কাছে সেই সাফল্য কি আমরা আশা করতে পারতাম না?

সেই যোগ্যতর প্রতিভা এই সাধনায় নিযুক্ত হয়নি। হয়তো তারই ফলে পরবর্তী কবিনেতারাও অক্ষরবৃত্তেই তুষ্ট, অত্যন্ত সাম্প্রতিক দু'একজন ছাড়া এই অবিজিত স্বরবৃত্তের জগৎটিতে কেউ এসে দাঁড়াতে উৎসুক নন। যদি তা দাঁড়াতেন, তাহলে হয়তো আমরা দেখতাম যে দিলীপ-

কুমারের ‘স্বরাক্ষরিক’ নামে পৃথক কোনো ছন্দ-পরিকল্পনা অবান্তর। স্বরবৃত্তের চরিত্রের মধ্যেই আছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আর সেই মুক্তি যেমন একদিকে তাকে করে নিতে পারে অক্ষরবৃত্তের আত্মার সঙ্গে লীন, অন্যদিকে—মাত্র তখনই—তার থেকে আমরা পেতে পারি বাংলার অন্যতম স্বাভাবিক ছন্দ, শুধু চলতি ক্রিয়াপদে নয়, চলিত বাক্‌স্পন্দে। হয়তো তখন রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সেই ভবিষ্যকথনের কিছু সফলতা আমরা দেখতে পাব। ভবিষ্যতের বাংলা ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দ হবে না বটে, কিন্তু সেই ছন্দেরই এক মুক্ত রূপ হতে তার বাধা কী?

১৯৬১

গদ্যকবিতা আর অবনীন্দ্রনাথ

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় সংকলন করে নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথেরও একটি গদ্যকবিতা। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা? বই খুলে প্রথমে আমরা চমকে গিয়েছিলাম সে-আমলে। কোথা থেকে সংগ্রহ হলো এই রচনা? কিন্তু না, একটু পরেই ধরা পড়ল যে কবিতা হিসেবেই সেটি যে রচিত তা নয়, এ হলো অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনারই ছিন্ন এক টুকরো। 'আলোর ফুলকি' বই থেকে স্তবাতুর একটি অংশ নির্বাচন করে বুদ্ধদেব তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটো-বড়ো ভাঙা কয়েকটি লাইনে, তৈরি হয়েছে তার একটা আপাত-পদ্যের গড়ন। আর এই রচনাটির সংকলন বিষয়ে খানিকটা তৃপ্তি নিয়েই জানাচ্ছেন সম্পাদক: 'অবনীন্দ্রনাথের গদ্যই যে কবিতা, তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি।'

অবশ্যই তৃপ্তিজনক ছিল ব্যাপারটা। এও নিশ্চয় ঠিক যে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কখনো কখনো এতই আবিষ্ট হয়ে ওঠে যে মনে হয় না গদ্যভাবনার সীমাতেই বন্দী আছেন তিনি, তাঁর গদ্য কখনো যেন স্পর্শ করতে চায় কবিতার ভূমি। এটা প্রত্যক্ষে ধরিয়ে দেবার একটা কৃতিত্ব ছিল, সন্দেহ নেই। এই স্পর্শ, তাঁর গদ্যের অন্তর্লীন কথকতা আর লাবণ্য, এর সঞ্চারময় ছন্দ—এ নিয়ে আমরা বিচারও শুনেছি অনেক। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় অবনীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করে নেওয়া সেই বিচারেরই এক পরোক্ষ ধরন, হয়তো সেই বিচারের একেবারে আদিপর্ব।

কিন্তু তাই বলে এ-ধারণাও কি সংগত হবে যে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যই ছিল কবিতা? আমাদের মনে পড়তেও পারে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই ঈষৎ-লঘু ভয়-জানানো: 'বোধহয়

কোনো প্রবন্ধে [তিনি] প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।' রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালেই ঠাকুরদাসের যখন মনে হয়েছিল যে তাঁর গদ্যে তাঁর পদ্যের চেয়ে 'ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়', তখন কি তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন কাকে বলে 'কবিত্ব'? যদি এই হয় যে, সে কেবল 'সুন্দর বেষ্টনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন' এক অভিজ্ঞতা, যা 'চারিদিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই', তাহলে সত্যিই তো, সে-অভিজ্ঞতা গদ্যরচনার মধ্যেও পেতে আর বাধা থাকছে কোথায়? তার জন্যে প্রচলিত অর্থে পদ্যছন্দেরও প্রয়োগ যেমন অনিবার্য নয়, তেমনি অনিবার্য নয় কোনো রচনার পক্ষে বিশেষ অর্থে কবিতা হয়ে ওঠা। যে 'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে গৃহীত ওই বাক্যপরম্পরা, সেও কি আমাদের নিয়ে যায় না এক সৌন্দর্য-লোকেরই দিকে আকর্ষণ ক'রে? তাহলে 'ছিন্নপত্রাবলী'কে কি বলব কবিতা? আবার উলটোপক্ষে, ঠাকুরদাসের ধরনে কেউ যদি বলেন যে এই 'ছিন্নপত্রাবলী'র যে-কোনো চিঠির 'কবিত্ব' তাঁকে মুগ্ধ করে, সে-কথারও নিশ্চয় কোনো-একটা মানে হবে আমাদের কাছে?

'ছিন্নপত্রাবলী'র কবিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু 'ছিন্নপত্রাবলী' কবিতা নয়। 'আলোর ফুলকি'র কবিত্বে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু 'আলোর ফুলকি' কবিতা নয়। এই সহজ আপাতবিরোধী ধারণাটি আমাদের মনে রাখতেই হয়। মনে রাখতেই হয় যে 'কবিত্ব' এবং 'কবিতা' শব্দদুটির প্রয়োগে অনেকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। 'কবিত্ব' আছে রচনার নিহিত নির্যাসে, তার দৃষ্টিতে, কিন্তু 'কবিতা' শব্দটির মধ্যে জড়িয়ে আছে সেই সঙ্গে 'বিন্যাস'-এর প্রশ্ন, 'ফর্ম'-এর কথা। সেই বিন্যাস বা ফর্মের দিক থেকে নিশ্চয় একথার কোনো মানে নেই যে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যই কবিতা। তা যদি হতো, তাহলে বুদ্ধদেবকে বিশেষ যত্নে নির্বাচন করতে হতো না 'আলোর ফুলকি'র একটা নির্দিষ্ট অংশ, যার এপারে-ওপারে গেলেই

নিশ্চয়ই স্খলিত হয়ে যেত তাঁর 'কবিতা'র ধারণা। এটা ঠিকই যে হয়তো তিনি সংগ্রহ করতে পারতেন 'বুড়ো আংলা' থেকেও খানিকটা, অথবা এমন-কী 'রাজকাহিনী'রও দু-একটি বর্ণনাঙ্গ, কিন্তু এসব বইয়ের যে-কোনো পৃষ্ঠাই কি তাঁর অভিপ্রায়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারত? 'আলোর ফুলকি' থেকে নির্বাচিত টুকরোটুকুর মধ্যেও তো, কবিতার ধ্বনিপ্রবাহকে লীলাময় করে তুলবার প্রয়োজনেই হয়তো-বা, দু-চারটি শব্দের পুনর্বিন্যাসও করতে হলো সম্পাদককে। 'সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রঙ ফিরে পায়' অথবা 'কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি'—এসব উচ্চারণের মধ্যে 'আপন' বা 'গান' শব্দদুটি তো স্পষ্টই যোজনা, আর শব্দগত ব্যুৎক্রমেরও একটি নিদর্শন ধরা রইল 'কে না আলোর জন্য কাঁদছে সারা রাত' পদটিতে, 'সারা রাত কাঁদছে'ই লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ নিজে। এইসব সংযোজন বা ব্যুৎক্রমের বৈধতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছি না আমি, কিন্তু এটা মানতেই হয় যে এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল কবিতার ধ্বনিরূপ বিষয়ে সম্পাদকের নিজস্ব কোনো অভাববোধ, অর্থাৎ গদ্য থেকে গদ্যকবিতায় নিয়ে আসবার আগ্রহে বুদ্ধদেবকে এখানে গড়েও নিতে হয়েছে অনেকটা।[১]

গদ্যে, আমরা জানি, লেখকের চেতনা বইতে থাকে হাজার শাখা-প্রশাখায়, তার বিস্তার প্রধানত বাইরের দিকে। অন্তর্মুখী বিষয়কেও গদ্য ধরতে চায় তার বাইরের দিকে উদ্ঘাটন ক'রে। কবিতায় আছে এর উলটো চলন। কবিতা বাইরের বিশ্বকেও আয়ত্ত করতে চায় ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে। এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন আমাদের

১ এ-বিষয়ে একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন আমায় (৩১ আগস্ট ১৯৭৩): 'তুমি যে গরমিলগুলো লক্ষ করেছো তার কারণ খুব সম্ভব এই যে অবনীন্দ্রনাথের রচনাংশটিকে গদ্যকবিতার রূপ দিতে গিয়ে আমি দু-একটি শব্দের হেরফের করেছিলাম।......তোমাকে না বললেও চলে, আমার লক্ষ্য ছিল ধ্বনিসৌষম্যের দিকে—"কিন্তু আমি গেয়ে চলি"-র বদলে "—গান গেয়ে চলি," "সারারাত কাঁদছে"-র বদলে "কাঁদছে সারারাত" আমার শ্রবণের পক্ষে অধিক প্রীতিকর।'

বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা, আমাদের বোধি আর প্রেরণা সমবেতভাবে সংহত হয় চেতনার এক কম্পমান বিন্দুতে, তৈরি হয় যেন শিখার মতো দীপ্যমান একটি রেখা, এই রেখাটিকে বিন্যস্ত করতে পারার মধ্যেই কবিতারচনার করণকৌশল লুকোনো। তখন তার যে অবয়ব তৈরি হয় —তার ছন্দ এবং ভাষা—তার মধ্যে প্রায় স্পষ্টই যেন দেখতে পাওয়া যায় এই কম্পন, এই vibration, যার অভাবে কোনো কবিতাই আর কবিতা নামের যোগ্য নয়। হতে পারে যে, কোনো বৃহৎ গদ্যরচনার কোনো একটি অংশে লেখকের চেতনা সংহত হতে হতে এমনি একটি মুহূর্তে এসে পৌঁছয়, সে-অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কোনো কবিতার মতো মনে হতেও পারে তাকে। অসম্ভব নয় এমন কোনো অংশ আবিষ্কার করে নেওয়া প্রুস্ত থেকে জয়েস থেকে বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ থেকে অথবা হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'র মতো কোনো বই থেকে। সেইরকমই সম্ভব অবনীন্দ্রনাথেরও কোনো গদ্যরচনা থেকে আকস্মিক কোনো কবিতার উদ্‌ভাস সংকলন করে নেওয়া, কিন্তু তার মানে নিশ্চয় এ নয় যে সমগ্রভাবে তাঁর গদ্যকেই বলা চলবে কবিতা, আর অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের পক্ষে সেই অভিধা পুরো গৌরবের কথাও নয় নিশ্চয়।

কিন্তু এই যাকে বলা হলো কবিতার লক্ষণ, তাকে তৈরি করে তুলবার জন্য পদ্যছন্দই কি অনিবার্য? তা যে সত্যি নয়, তত্ত্বে ব্যাখ্যায় আমাদের দেশেও এ জ্ঞান প্রায় একশো বছরের পুরোনো আজ। কবিতা কেন পদ্যেই লিখতে হবে, এ প্রশ্ন তুলেছিলেন বঙ্কিম তাঁর 'কবিতাপুস্তক' বইটিতে (১৮৭৮), তাঁর মনে হয়েছিল যে 'অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী' আর সেই উপযোগিতার উদাহরণ হিসেবে তিনটি গদ্যরচনা তিনি ছাপিয়েওছিলেন কবিতার নামে। কিংবা রাজকৃষ্ণ রায় লিখেছিলেন (১৮৮৪) আরো একটু এগিয়ে: 'যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোনো কোনো বিষয় এইরূপ পদ্যপৌংক্তিক প্রণালীতে' সাজিয়ে লেখার একটা

মানে আছে। বঙ্কিম লিখতে চেয়েছিলেন গদ্যেরই চেহারায়, আর রাজকৃষ্ণ তাকে ভেঙে নিয়েছেন পদ্যের ছলে, কিন্তু উদাহরণ হিসেবে এর কোনোটিই হয়ত পাঠককে আজ আপ্লুত করে না তেমন। 'ধীরে ধীরে বায়ু-স্রোতে/একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।/সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন ?'—ধরনের আকুলতায় বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা, বোধি আর প্রেরণার সেই মিলনমুহূর্তটির শিখাগ্রতাপ যে কিছুমাত্র অনুভব করা যায় না তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এ চেষ্টাগুলি তাই হয়ে থাকে কেবল জাদুঘরেব সামগ্রী, ইতিহাসের ভোজ্য মাত্র, এর তেমন কোনো তাৎপর্যময় মূল্য নেই আমাদের প্রবহমান কবিতাচর্চায়।

আমরা সবাই জানি সেই মূল্যের সূচনা রবীন্দ্রনাথেব রচনাতেই, তাঁরই গদ্যকবিতায়। কিন্তু তাঁব সেই গদ্যকবিতা গড়ে ওঠার মন্থর ইতিহাসে আর কারো কি ভূমিকা ছিল কোনো ? উপনিষদ বা বাইবেল, হুইটম্যান বা তাঁব নিজেরই গীতাঞ্জলি-অনুবাদ, এসব প্রসঙ্গের উল্লেখ ববীন্দ্রনাথ নিজেই করেন তাঁর গদ্যছন্দের প্রেরণাভূমি হিসেবে। কিন্তু প্রস্তুতির এক দ্বিধান্বিত পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অনুজদের হাতে পরীক্ষা কবিয়ে নিচ্ছিলেন ভাবীকালের কোনো কোনো পথ, সে তথ্যও আমরা ভুলতে পারি না এখানে। কখনো সত্যেন্দ্রনাথকে কখনো অবনীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত কবেছেন তিনি নবীন প্রকরণের সন্ধানে বেরুবার জন্য[২], আব, অন্তত অবনীন্দ্রনাথ, বেরিয়েও পড়েছিলেন লোকাপবাদের ভয় না করে অনেকবার অনেকদিকে—রবীন্দ্রনাথের আগেই তিনি লিখে রেখেছিলেন এমনও কয়েকটি রচনা, যা হয়ে উঠতে চাইল গদ্যছন্দের নিদর্শন, কেবল

২ 'আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম।...তারপর আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ ১৯৬২, পৃ ১৮৬-৮৭।

গদ্যের ছন্দের নয়।[৩]

২

১৩২৬ সালের বৈশাখ থেকে 'ভারতী'তে ছাপা হচ্ছিল 'আলোর ফুলকি'। ওই বছরেরই আষাঢ় থেকে শুরু হলো 'লিপিকা'র প্রথমাংশের কথিকা-গুলি, 'প্রথম শোক' বা 'প্রশ্ন', 'সতেরো বছর' বা 'কৃতঘ্ন শোক'-এর মতো রচনা। এই লেখাগুলির কী নাম বলা হবে তা আজও যখন তেমন স্পষ্ট নয়, তখন সেদিনকার বিহ্বলতা আমরা অনুমান করতে পারি। 'ভারতী' পত্রিকার সূচিপত্রে রচনাগুলি ছিল শ্রেণীপরিচয়হীন। আব এইরকমই শ্রেণীপরিচয়হীন অথবা কখনো 'শব্দচিত্র' ধরনের অস্পষ্ট কোনো পরিচয়ে নানা পত্রিকায় দেখা দিতে লাগল অবনীন্দ্রনাথেরও কিছু টুকরো লেখা, গদ্যরচনা থেকে নিজেকে পৃথক করে তোলাই ছিল যার অভিপ্রায় :

আসে না, জল আসে না—মাটির অন্তরে দুঃখ লাগে। বয় না, নদী বয় না—
উদাস মাঠ শূন্যমন আকাশে চায়।
শুকনো বালুচরে লুপ্ত ধারার শেষ চিহ্ন, বাতাস সেখানে ঘোরে ফেরে—হুতাশী বাতাস।
আকাশ যেন সে পিযাসী চাতক—ক্ষণে ক্ষণে বলে জল। সুদূরে সমুদ্র ডাকে

---

৩ সুরচিত গদ্যমাত্রেরই একটা ছন্দপ্রবাহ আছে। তার ধ্বনির উত্থান-পতনে, তার যতির হ্রস্বদীর্ঘতায়, তার শব্দব্যবহারের সুমিত বলয়ে—তৈরি হয় এই ছন্দ। এর কোনো পূর্বনির্দিষ্ট নিরূপিত ধরন নেই। একেই বলা যায় গদ্যের ছন্দ। এই ছন্দ শুনেই 'পথের পাঁচালী'র অপু একদিন মুগ্ধ হয়েছিল তার ছেলেবেলার পাঠশালায়, ভেবেছিল বড়ো হয়ে খুঁজে নেবে রামায়ণ মহাভারতের দেশ। আর এর তুলনায় গদ্যছন্দ কথাটির প্রয়োগ একটু বিশেষিত। গদ্যকবিতা নামে চিহ্নিত যে বিশেষ রচনাশ্রেণীটি, এ হলো তার ছন্দ। এরও নেই কোনো পূর্বনির্ধারিত রূপ। কিন্তু শ্রুতিতে বা অনুভবে বুঝে নেওয়া যায় সাধারণ গদ্যের ছন্দের থেকে এর স্বতন্ত্র এক স্পন্দন, হয়তো খানিকটা ছোটো আর সুষমাময় হয়ে আসে এর শ্বাসপর্বগুলি।

—নদী নদী ! হারানো ঝরনার পাথরে পাথরে পৌঁছয় সাগরজলের খেদ, পর্বত প্রতিধ্বনি দেয়—নদী নদী !

[আসাযাওয়া : অংশ]

'লিপিকা' থেকে 'পুনশ্চ' পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেকদিন। মানতেই হয়েছিল তাঁকে যে 'লিপিকা'র 'বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ'। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ কাটিয়ে উঠছেন তাঁর ভীরুতা, বা বলা যায় কোনো কারণই ছিল না তাঁর ভীরুতার, চিত্রী বা 'কলাবিৎ' অবনীন্দ্রনাথের কোনো প্রত্যক্ষ দায় ছিল না যেন সেদিনকার কবিতা-পাঠকের কাছে, তাই অনেকটা নিজের খুশিতেই তিনি লিখে যাচ্ছেন 'হাওয়াবদল'-এর মতো রচনা, আর তার পরেই এল 'পাহাড়িয়া' কবিতাগুচ্ছ।

'হাওয়াবদল'-এ ধরা আছে যেন শহুরে মানুষের শৈলবাসী হবার দীর্ঘ পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো ছবির টুকরো এখানে ধ্বনিমান্ হয়ে উঠছে কথায় ! চোখ চলছে শিয়ালদহ পেরিয়ে শহরতলি, শহরতলি থেকে পদ্মা জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি সুকনা তিস্তা, আর সেইভাবে চলছে উপ-শিরোনাম নিয়ে এক-একটা টুকরো স্তবক :

আকাশের নীল পাহাডের গায়ে গডিয়ে পডেছে, পাহাড়ের নীল বনের ধারে বিছিয়ে গিয়েছে, বনের নীল বালিয়াডির বুকের পথে বইছে কূলহারা সমুদ্র-জলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

[তিস্তা]

এই তিস্তার পর পাহাড়তলি, তারপর পর্বত, যে-পর্বতে

মন বলে দিন দুপুর, বন বলে নিশুতি রাত ! বনের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ বলে শরৎকাল, গাছের পাতায় ঝিঁ ঝিঁ বলে বর্ষা যায় নি বৃষ্টি থামে নি মেঘ লেগেছে দিকে দিকে।

আর ঠিক তার পরেই, যেন শৈলচূড়ায় পৌঁছে খুলে গেল সব সাংসারিক অভ্যাসের গণ্ডি, ভেঙে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ গদ্যের চেহারা, ওই একই

ধরনের গদ্য তিনি সাজিয়ে দিলেন ছোটোবড়ো নানা মাপের পঙ্‌ক্তিতে, তৈরি হলো গদ্যকবিতার একটা প্রাথমিক মূর্তি। পাহাড়িয়া, রংমহল, তিনদরিয়া, মেঘমণ্ডল—শ্রাবণ থেকে কার্তিক পর্যন্ত ১৩৩৪-এর 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত এই রচনাগুলি বস্তুত একই বিস্তারিত রচনার অন্তর্গত যেন, সবটা মিলে ধরা আছে অবনীন্দ্রনাথের পাহাড়িয়া অভিজ্ঞতা। আর এই প্রথম, কোনো দ্বিধান্বিত পরিচয় বা অপরিচয়ের মধ্যে না রেখে এই রচনাগুলিকে দেওয়া হলো একটি শ্রেণীনাম, ঘোষণা করা হলো তাকে 'গদ্যছন্দ' অভিধায়।

আমাদের জানতে ইচ্ছে করে পাঠকদের কাছে কীভাবে পৌঁছেছিল এই লেখাগুলি, এই 'পাহাড়িয়া'গুচ্ছ অথবা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত 'আতস-বাজি' নামের দীর্ঘ রচনাটি। এ নিয়ে তেমন কি ভেবেছিলেন কেউ, না কি শিল্পীর খেয়াল ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অবহেলায়। স্বস্তি যে ছিল না তার কিছু ইতস্তত নজির ধরা আছে সাময়িকীর পৃষ্ঠায়, বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে। 'আপন কথা'র গদ্য পড়তে পড়তেই 'মানসী ও মর্মবাণী' লিখছিল সেদিন (১৩৩৪ আষাঢ়) 'এরূপ ভাষা এরূপ ভাব আমরা বুঝিতে পারি না। লেখক কলাবিৎ। কীভাবে পাঠ করিলে আমরা তাঁহার রচনার রস উপলব্ধি করিতে পারি তাহা বুঝাইয়া দিতে আমরা তাঁহাকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।' নূতন এই গদ্যছন্দগুলি বিষয়েও এ বিহ্বলতা প্রত্যাশিত ছিল, আর সেটা দেখা দিল ঈষৎ তির্যক বাচনে, 'পাহাড়িয়া' পর্যায় শেষ হয়ে যাবার পর যেমন 'মানসী ও মর্মবাণী' বলছে সকৌতুকে (১৩৩৪ পৌষ) : 'যাক পাহাড়িয়া নাই খেয়ালিয়া আছে। সম্পাদক মহাশয়ের খেয়াল থাকিতে বিচিত্রার বৈচিত্র্য নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।'

এর প্রায় চার বছর পর রবীন্দ্রনাথ শুরু করছেন তাঁর 'পুনশ্চ'র কবিতাগুচ্ছ।

সমকাল কীভাবে নিচ্ছিল এই লেখাগুলিকে, তার চেয়েও বড়ো একটা প্রশ্ন আছে অবশ্য। অবনীন্দ্রনাথকে কেন পৌঁছতে হলো এই গদ্য কবিতার অবয়ব পর্যন্ত ? কোন্ প্রয়োজন ছিল তাঁর নিজের ? অভিজ্ঞতা কীভাবে নিজের চাপেই তৈরি করে নেয় শিল্পের প্রকরণ, বুদ্ধদেব সেকথা লিখেছিলেন একবার নরেশ গুহকে, পুরোনো একটি চিঠিতে। কবিতা বিষয়ে সেখানে বলেছিলেন তিনি 'রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সে হুকুম তামিল করি মাত্র'। কিসের হুকুম ? কোনো একটা সময়ে কোনো কবিকে লিখতেই হবে গদ্যকবিতা ? অন্তর্গত কোন্ প্রেরণার টানে ? হুইটম্যানকে যে তাঁর কবিতায় ধরতে হয়েছিল দুতিন-লাইনজোড়া ড্যাশচিহ্নবহুল বিস্তারিত এক-একটি গদ্যচরণ, অথবা এর কিছু-বা বিশৃঙ্খল শব্দোল্লাস—তার ভিতরদিকে ছিল সেদিন আমেরিকার ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, যে-ব্যাপ্তি তখন সেখানে উদ্‌গত হতে চাইছিল দেশ থেকে বহির্দেশ পর্যন্ত। অথবা একশো বছর পরের মার্কিন দেশে রবার্ট ক্রিলি যখন তাঁর গদ্যকবিতায় তৈরি করেন ছোটোখাটো লাইনভাঙা—এমন-কী শব্দভাঙা—চরণগুলি, তখন তার সপ্রতিভ ভঙ্গিলতার মধ্যে কাজ করে যায় যেন আজকের দিনের বিহ্বল অসমশ্বাস ঘাতসংকুল টুকরো জীবনের চিহ্ন। সমর সেনের মনে হয়েছিল ছন্দোহীন পরিহাস্য এই সামাজিকতাকে ধরবার জন্য চাই মোহভাঙা কঠোরতায় গদ্য সাজানোর ভঙ্গি। আর রবীন্দ্রনাথও, অন্তত তত্ত্বে, ভেবে নিয়েছিলেন যে কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে আজ, গদ্যেই আজ সম্ভব 'বাস্তব জগৎ এবং রসের জগতের সমন্বয় সাধন', গদ্যেই সঞ্চার করা যায় আজকের দিনের যোগ্য 'অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল প্রান্তর বা কান্তারের' নানা মেজাজের রূপ। এমন কোনো নতুন মেজাজ বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক থেকে কি এগোচ্ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকবিতার দিকে ? এটা ঠিক যে 'পাহাড়িয়া'-গুচ্ছ সূচিত হবার ঠিক একমাস আগে 'নতুন ও পুরোনোর ছন্দ' প্রবন্ধে তিনি

লক্ষ করছিলেন 'হঠাৎ বয় ঘূর্ণি বাতাস নতুন ছন্দে মাঠে হাটে', দেখতে চাইছিলেন এক নূতন বন্ধন, যেখানে 'নতুন বোঁটা পুরোনোর সঙ্গে ছন্দে বাঁধা শক্ত রকমে'। কিন্তু এই দেখতে চাওয়াটুকু থেকেই কি তৈরি হতে পারত বাংলার নতুন এক ছন্দ-রূপ?

এর উত্তর ভাবতে গেলেই মনে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই অবনীন্দ্রনাথ এই গদ্যকবিতার দিকে এগোচ্ছিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই দুই বিপরীত দিক থেকে চলছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। নিজের গদ্যছন্দ বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেবলই জানান 'লিপিকা'র কথা, 'পুনশ্চ'র পাঠকেরাও তাই মনে রাখতে বাধ্য হন 'লিপিকা' প্রসঙ্গ,- কিন্তু তা মনে রেখেও এখানে আমি বলতে চাই যে 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চ'র কোনো অব্যাহত যোগ নেই, পরম্পরার সম্পর্ক নেই, 'পুনশ্চ' ঠিক 'লিপিকা'রই পরবর্তী পরীক্ষণ নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এপারে-ওপারে দুই ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই আমরা; প্রথম পর্বে যিনি একের পর এক তৈরি করছিলেন নানারকম বন্ধনের চারুতা, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কাজ চলছিল কেবলই সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার আয়োজনে। পদ্যছন্দেরও বাঁধন তিনি কাটতে শুরু করে-ছিলেন 'বলাকা' থেকে। 'বলাকা'র সমিল মুক্তবন্ধ আর 'বাঁশি'-ধরনের[৪] রচনায় অমিল মুক্তবন্ধের পর ছন্দ-মোচনের আর-একটি স্তর রইল বাকি, আর সেই স্তরটিই সম্ভব হলো 'পুনশ্চ'তে। এই সম্ভাবনার পূর্বমুহূর্তে

৪ এই 'বাঁশি' কবিতা নিয়ে একটি সংকট চলে আসছে বাংলা আলোচনায় আজ অনেককাল হলো। কোনো রহস্যময় কারণে, রাবীন্দ্রিক গদ্যকবিতার সফলতা বা ব্যর্থতার প্রধান উদাহরণ হিসেবে এই পদ্যছন্দের কবিতাটিকেই টেনে আনেন সমালোচকেরা বারবার, আর তাঁরা বেশ মাননীয় সমালোচক। তার শেষ প্রমাণ দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' বইটিতে, লেখক যেখানে পরম গাম্ভীর্য নিয়ে অনুযোগ করেছেন যে এই কবিতার অধিকাংশ চরণই না কি পদ্যছন্দের! আর অধিকাংশের বাইরে বাকি চরণগুলি? সেটা বোধহয় এঁরা আর লক্ষ করেন না তেমন।

তাঁকে দেখে নিতে হচ্ছিল অবনীন্দ্রনাথের চর্চা আর তার বিফলতার প্রকৃতি, বুঝে নিতে হচ্ছিল কোন্‌খান থেকে সরে আসতে হবে তাঁকে। তাই 'লিপিকা' থেকে 'পরিশেষ' (প্রথম সংস্করণ), 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চ'-তে পৌঁছবার পথটিই বরং আমাদেব কাছে স্পষ্ট লাগে আরো। আর ঠিক সেই জন্যেই এটা লক্ষ করা জরুরি মনে হয় যে 'লিপিকা'র বাক্যগুলিকে আপাত-পদ্যের আকারে খণ্ডিত করে নিলেও তার থেকে মিলত না 'পুনশ্চ'র যোগ্য ছন্দস্পন্দন, এ-দুয়ের চরিত্রই ছিল ভিন্ন। ভাবে কিংবা ভাষায় সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা দূর করবার কোনো আয়োজন নেই 'লিপিকা'র রচনাবলিতে, তাকে যেন ঘিরে নেওয়া হয়েছে একটু বেশিরকমই কবিত্বমণ্ডনে, সেই প্রথাময় মেঘ আর বাঁশি আর শোক আর প্রেমের নিমগ্নতাই হলো এর নিশ্চিত আলম্বন।

অবনীন্দ্রনাথেরও গদ্যকবিতায় যে এই মেঘমণ্ডলের সচেতন আড়ম্বর, তাব কারণ লুকোনো আছে এইখানেই। পদ্যছন্দকে খুলতে খুলতে গদ্যকবিতার দিকে পৌঁছন রবীন্দ্রনাথ, আর গদ্যকেই কবিতার সাজ পরিয়ে নিতে নিতে গদ্যছন্দকে ধবতে চান অবনীন্দ্রনাথ। এই হলো তাঁদের বিপরীতমুখী চলন। লোকজাবনের বাইরের বাস্তবিক তাপটা নয়, অবনীন্দ্রনাথ অনেককাল ধবেই অর্জন করতে চাইছিলেন লোক-জীবনের চিরন্তন অন্তঃস্বাদটিকে শুধু। রূপকথার অভিজ্ঞতা বা মেয়েলি ব্রতাচারের জগৎ থেকে যে অনায়াস স্পন্দ তিনি সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন মনে মনে, তারই ফলে সেই 'শকুন্তলা'র মুহূর্ত (১৮৯৫) থেকে তাঁর কাছে সহজ ছিল চলিত গদ্যের টান। তাঁর সেই চলিত রীতির পূর্ণ ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে আমরা ভুলে যাই অনেক সময়ে, চলিত গদ্যের ইতিহাস রচনাতেও ভুলে যাই যে, 'সবুজপত্র' ছাপা হবার অনেক আগেই (১৯০৪) প্রকাশ্য সাময়িকীতে সম্ভব হয়েছিল 'রাজকাহিনী'র মতো সুঠাম মৌখিক গদ্য। 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল'-এর মধ্য দিয়ে এ গদ্য ক্রমে (১৯১৯) পৌঁছয় 'আলোর ফুলকি'তে। আলাপচারিতে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'impassioned prose', এ হয়তো সেরকমই এক

তাপিত গদ্যের মোহময় নমুনা। এই গদ্যকেই কি আরো একটু আক্রান্ত করে তোলা যায়? 'কবিত্বে'? যেন তারই চেষ্টা থেকে সম্ভব হলো অবনীন্দ্রনাথের 'শব্দচিত্র', আর তার থেকে তাঁর অল্প সময়ের গদ্যছন্দের উৎসারণ।

কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠবে, এই চিত্রগুলির মধ্যে এমন কি ছিল যা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যেই বলেননি বা বলতে পারতেন না। অবয়বের হ্রস্বতা ছাড়া আর কোন্ অনিবার্যতা আছে এর? এর জন্য গদ্যকবিতা নামিক ভিন্ন একটা শিল্পরূপের দরকারই-বা হবে কেন? বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন বটে যে তাঁর গদ্যই কবিতা, কিন্তু ঠাকুরদাসের ধরনে কি আমরা উলটো করে বলতে পারি না যে তাঁর কবিতা বস্তুত গদ্য? রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি চলল না তার ভাষাগত বাহুল্যে, পরিমিতিবোধের অভাবের জন্যই তা পৌঁছল না কাব্যের সীমায়। হয়তো একথা তত সত্য নয়। এটা ঠিক যে অবনীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি বর্ণনাপুঞ্জে ভারি, তার মধ্য দিয়ে মন ছড়িয়ে দেবার অবকাশ কম, পড়তে পড়তে হাঁফ ধরে যায় আমাদের। কিন্তু 'পুনশ্চ' থেকে 'পত্রপুট' পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতেই গদ্যছন্দের নানা ছাঁচ তৈরি হয়ে যায় বাংলা কবিতায়, আমরা টের পাই যে এই অর্থে ভাষাবহুলতা রবীন্দ্রনাথেও আসে অনেকসময়ে, অথবা রবীন্দ্রপরবর্তী কবিতাও এর থেকে মুক্ত নয় একেবারে। ভাষাবাহুল্য নয়, গদ্যকবিতার এই চর্চা থেকে অবনীন্দ্রনাথকে সরিয়ে নিচ্ছে তাঁর গদ্য বিকল্পটি, এই বিকল্প হাতে ছিল বলেই গদ্যকবিতা আর অনিবার্য ছিল না তাঁর কাছে। তাঁর নয় পতনবন্ধুরতাময় পতিত সংসারের সঙ্গে দরবার, আধুনিক জীবনের নাটকীয় কোনো সংকট তাঁর বিষয় নয়, তাঁর আছে 'শাজাহানের স্বপ্ন'র মতোই ধূসর ও চাপা 'টোনে'র স্বপ্নমণ্ডল, তাই 'আতসবাজি'র পর আবার তিনি ফিরতে লাগলেন 'লিপিকা'পন্থী গদ্যে, 'রংমশাল'-এর (১৩৩৫), 'আলোকশিখা' লেখাটি যেমন, আর তারও পরে 'নতুন খাতা' (১৩৩৬) 'অশথপাতা' (১৩৩৭) ধরনে দুচারটি

লেখচিত্রের পথ ধরে ফিরে এলেন তিনি তাঁর নিজেরই গদ্যের ভূমিতে, তাঁর পুঁথিকথা বা স্মৃতিকথার আচ্ছন্ন কথকতায়। এই গদ্যের যে মহিমা আমরা দেখি, সে কোনো গদ্যছন্দে নয়, গদ্যের ছন্দে। যতটুকু শব্দসংগীত রচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি, তা সম্ভব ছিল এই গদ্যেই; গদ্যকবিতার আর দরকার হলো না তাঁর। তাই গদ্যকবিতায় অবনীন্দ্রনাথের এই যাওয়া আর ফিরে-আসাকে গণ্য করতে হয় তাঁর গদ্যরচনারই অনুষঙ্গ হিসেবে। উলটো দিকে, সেই একই সঙ্গে এই বৃত্তান্ত আমাদের কাজে লাগে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের কবিতাচর্চারও একটা নেপথ্য অধ্যায় বুঝে নেবার জন্য।

১৯৭৩

শত জলঝরনার ধ্বনি

প্রবীণ একজন ছান্দসিক একটি চিঠিতে লিখেছিলেন একবার : আমাদের জাতীয় স্বভাবের মধ্যে আছে আলস্য আর মন্থরতার বীজ, আর সেই-জন্যেই জীবনানন্দের ছন্দ আমাদের এত প্রিয় আজ। কথাটা অবশ্য লিখেছিলেন তিনি হালকা চালেই, কবিতা বা ছন্দের চেয়ে আমাদের স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিতই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু তবু তাঁর আকস্মিক এই ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয় হয়তো। সত্যিই কি আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে, আমাদের ভীরু পলাতক ক্ষীণপ্রাণতার সঙ্গে, এমন কোনো গূঢ় যোগ আছে জীবনানন্দের মন্থর ছন্দস্পন্দের? এই মন্থরতা আর আলস্য কি সমার্থক একেবারে? এই আলস্য, এই কবিতা কি শেষপর্যন্ত জীবন থেকে সরিয়েই আনে আমাদের?

ছন্দের এই অলসতা অবশ্য অনেকদিন আগে লক্ষ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুও, যখন তাঁর কুড়ি বছর বয়স। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলি যখন ছাপা হচ্ছে নানা পত্রিকায়, এর নতুন সুরে অভিভূত বুদ্ধদেব তখন লিখছেন 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায় : 'এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে থেমে, অজস্র ড্যাস ও কমার বাঁধে ঠেকে ঠেকে উদাস অলস গতিতে বয়ে চলেছে।' বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে লিখেছিলেন একথা ; আর ঠিক স্পষ্ট ভাষায় যাঁরা এটা বলতে পারেননি সেদিন, জীবনানন্দের সেই নিতান্ত অমনোযোগী পাঠকও নিশ্চয় অনুভব করতে পারতেন তাঁর কবিতার মধ্যে নিহিত এই ঔদাস্য। কিন্তু ছন্দ-রূপেই থেমে থাকে না পাঠকের মন, সেখান থেকে অলক্ষ্যে তা কবির ব্যক্তিরূপেও গিয়ে পৌঁছয়। আর তখন, হয়তো একটু ভুলভাবেই, এই ঔদাস্যকে আমরা ভাবতে শুরু করি তাঁর সমস্ত জীবনবোধেরই প্রকৃতি, তাঁর সমস্ত শিল্পভাবনারই চরিত্র।

তা না হলে এই কথাটা এত ছড়াতে পারত না যে বড়ো-বেশি ভুল ছন্দে কবিতা লেখেন তিনি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবাহে শব্দকে আমরা যেভাবে পেতে অভ্যস্ত এখন, জীবনানন্দ অনেকসময়েই সে-অভ্যাসের বাইরে চলে যান, একথা ঠিক। এও ঠিক যে শেষদিকে যে-স্বরবৃত্তের ব্যবহার এনেছিলেন তিনি কবিতায়, তাও আমাদের প্রচলিত অভ্যাসকে আঘাত করে কখনো কখনো। কিন্তু, বিহারীলালের শিথিল ছন্দ আর শব্দ প্রয়োগের কথা ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন মনে করিয়ে দেন যে এ তাঁর অক্ষমতাজনিত নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ; জীবনানন্দের ছন্দে এই ভিন্ন ব্যবহারকেও কি সেই দৃষ্টিতেই বিচার করা সংগত নয়? হঠাৎ যাকে মনে হয় অক্ষমতা বা অমনোযোগ, জীবনানন্দের সমস্ত মনটিকে বুঝে নিলে হয়তো-বা দেখতে পাব সেইটেই ছিল তাঁর গভীরতর অভিপ্রায়ের অংশ।

কেননা, রচনার কারুকাজে কোনো অন্যমনস্কতার চিহ্ন তাঁর স্বভাবে বড়ো-একটা দেখতে পাই না। যে-কোনো-একটি কবিতা গড়ে তুলবার জন্য তাঁর শ্রমের চিহ্নই বরং ব্যাপকভাবে ছড়ানো আছে তাঁর কবিতার খাতায়। সেই খাতা একবার হাতে পেলে দেখা যায় কীভাবে কোনো-একটি কবিতার নামের জন্যই হয়তো তিনি ভাবছেন বারবার, কেবল সেই নামটিই হয়তো বদল করছেন আটবার কি দশবার। যদি তাঁর রচনাবলির ভেরিওরাম সংস্করণ ছাপা হয় কখনো, দেখতে পাব যে-কোনো-কবিতায় কত অসংখ্য তাঁর পাঠান্তরের প্রক্রিয়া। আর, তাঁর আপাত-বিহ্বল 'কবিতার কথা'র প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়বে, কবিতার শরীর নিয়ে, তার ছন্দ নিয়ে, কত সতর্কভাবেই ভাবতে চেয়েছিলেন তিনি দিনের পর দিন। এটা অবশ্য ঠিক যে 'কবিতার আত্মা ও শরীর' প্রবন্ধে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে অতর্কিতে একবার তিনি বলে ফেলেছিলেন স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের একটি উদাহরণের নিচেই লিখে বসেছিলেন যে 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাঙলা কবিতায় বেশি নেই।' কিন্তু এই একটি ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে দেখব সেই

প্রবন্ধে কীভাবে জীবনানন্দ ভাবছেন এই যুগের উপযুক্ত কাব্যছন্দ আবিষ্কার করে নেবার কথা, কীভাবে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ঈশ্বর গুপ্ত বা পোপ-এর ধরনে যতিপ্রান্তিক ছন্দের আর দরকার নেই আজ। অন্যত্র, তিনি লক্ষ করতে ভোলেন না যে ছন্দকে ভালোবেসেও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আঙ্গিকে দীন, তাঁর ছন্দের সমস্ত সংগতের পিছনে কাজ করেছে কেবল বিলাসব্যসনেব ইচ্ছে। কিন্তু ছন্দ তো বিলাসকৌশল নয়, পাঠকের মনভোলানোর আয়োজন মাত্র নয় ছন্দ, সে তো শরীব হয়েও জাগিয়ে তোলে কবিতাব আত্মাকেই! 'Rhythmics is in a certain respect, the logic of art'—জীবনানন্দকেও নিশ্চয় মনে রাখতে হয় এই কথা। আর তাই বলতে শুনি তাঁকে: 'অর্থ অস্বচ্ছ বোধ হলে কবিতাটির ধ্বনিগুণ সম্পর্কে অন্তত চেতনার স্পষ্টতায় পাঠকের সুবিধে হবে মনে হয়, কবিতাটির ইঙ্গিত ধরা পড়বে তাহলে, অর্থ পরে বোঝা যেতে পারে।' এইভাবে, মানে বলবার আগেই কবিতা তাব পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় ছন্দ, সুর; মনের মধ্যে অগোচরে একটা অভিপ্রেত জগৎ তৈরি হয়ে ওঠে এইভাবে।

তাঁর নিজের কবিতাতেও কি ছিল না এই 'অর্থগত অস্বচ্ছতা'? 'সহজ শব্দে শাদা ভাষায় লিখেছি বটে, কিন্তু তবুও কবিতাটি হয়তো অনেকে বুঝবে না': খাতায় এ-রকম মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন জীবনানন্দ, তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটির বিষয়ে। কেবল এই একটি কবিতাই নয় অবশ্য, কবি নিশ্চয় জানতেন যে তাঁর অনেক কবিতারই নতুন সুরের সঙ্গে 'চলতি বাঙালি পাঠক ও লেখক খুব কম পরিচিত'; তিনি জানতেন যে তাঁর নিজের মুদ্রাদোষে সকলের চেয়ে আলাদা হয়ে আছেন তিনি, কবিতার সঙ্গে পাঠকের তৈরি হয়ে আছে একটা অর্থছিন্নতার ব্যবধান। তাহলে পাঠকের কাছে আর কোন্ পথে পৌঁছবেন তিনি? এই অস্বচ্ছ অর্থের মধ্য দিয়েও তাঁর বোধের জগৎ কীভাবে তিনি তুলে দেবেন পাঠকের হাতে? তাঁর নিজেরই ধারণামতো বলা যায় যে কবিতার ধ্বনিগুণই সেই পথ, ছন্দই সেই পথ। সচেতনভাবে তাই

তিনি তৈরি করতে চান তাঁর কবিতার ধ্বনি, যার মধ্য দিয়ে কবিতার ইঙ্গিত যোগ্যভাবে পৌঁছতে পারে যে-কোনো পাঠকের চেতনায়।

অবশ্যই, এই ধ্বনির চাই বিশিষ্টতা। 'যে-কোনো আবেগ যে-কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না', জীবনানন্দ জানেন যে 'কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতি নির্ণয় হয়।' তাহলে এই প্রশ্ন এবার আমরা তুলতে পারি, তাঁর কবিপ্রেরণার স্বভাবে কোন্ ছন্দকে নির্বাচন করে নেবেন জীবনানন্দ? কোন্ ছন্দের মধ্য দিয়ে ঠিক-ঠিক আধার পাবে তাঁর আবেগ?

এখনো পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে ধরা আছে জীবনানন্দের যে কবিতাগুলি, তার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো[১]। হিসেব নিলে দেখা যাবে এর অন্তর্গত ২৭৫টি কবিতাই অক্ষরবৃত্তে লেখা, আর অন্যগুলি ছড়ানো আছে গদ্যছন্দে বা স্বরবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে। এই অক্ষরবৃত্ত—যাকে 'পয়ার' বলতেই পছন্দ করতেন জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেব—এ তো জীবনানন্দের নিজস্ব কোনো ছন্দ নয়, এ তো বাংলা কবিতার চিরন্তন প্রধানতম বাহন! এইটেই যে বাংলা কবিতার সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়, তত্ত্বে বা প্রয়োগে সব-কবিই সেকথা মনে করিয়ে দেন আমাদের। মনে করান জীবনানন্দও: 'অন্য কোনো ছন্দ যে পয়ারের এই শীর্ষদেশী মাহাত্ম্য ও গহনতার স্থান নিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রধান কবিদের রচনায় তা স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে রয়েছে।'

১ পুরো হিসেবটা এই: ৩৫২টি কবিতার মধ্যে গদ্যছন্দ ২৪ অক্ষরবৃত্ত ২৭৫ মাত্রাবৃত্ত ১৬ স্বরবৃত্ত ৩৭। এর মধ্যে কেবল 'ঝরা পালক' বইতেই আছে ১৫টি মাত্রাবৃত্ত আর ৭টি স্বরবৃত্তে গাঁথা কবিতা। এই হিসেবের মধ্যে গোপালচন্দ্র রায়-সংকলিত 'সুদর্শনা'ও গণ্য হলো।

একথা যদি 'স্বতঃপ্রমাণিত'ই হয়, যদি এই হয় যে আধুনিক বাংলা কবিতাতেও 'পয়ার প্রায় সর্বব্যাপী', যদি এই হয় যে অন্য কোনো ছন্দ এর জায়গা নিতে পারে না আজ, তাহলে এর মধ্যে আর নির্বাচনের প্রশ্ন থাকছে কোথায়? জীবনানন্দের কবিপ্রেরণার স্বাতন্ত্র্য তাঁকে পৌঁছে দিচ্ছে এই অক্ষরবৃত্তে, একথার আর কি মানে রইল কিছু? তবে কি পুরোনো এই ছন্দের মধ্যে কবি নতুন-কোনো সুরের সঞ্চার করতে পারছেন আজ?

তখন আমরা লক্ষ করি যে জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত প্রথম থেকেই টেনে আনতে চায় এমন একটা আবহ, এমন একটানা এক সুর, বাংলা কবিতায় যা নূতন। বৃত্তে তিনি সবার সঙ্গে সমান, কিন্তু তার স্পন্দনে নয়। একসময়ে কবিতার ছিল একটা আঁটো গড়ন, সমান মাপের পঙ্‌ক্তিবন্ধনে তার ভাস্কর্য ছিল স্থির, সহজ ছিল কবিতায় একটা ভারি আর জমকালো আওয়াজ তৈরি করে তোলা। রবীন্দ্রনাথের হাতে একদিন অক্ষরবৃত্তের সে বন্ধন গেল খুলে। কিন্তু তখনো সেখানে যুক্তব্যঞ্জনের সংঘাতময় শব্দবিন্যাসে অথবা তার পঙ্‌ক্তিমাপের দ্রুতবদলে রয়ে গেল উত্থানপতনময় এক বন্ধুরতা। জীবনানন্দ তাঁর অক্ষরবৃত্ত থেকে সরিয়ে নিলেন এই উত্থানপতন, এই ব্যঞ্জনসংঘাতের প্রবলতা, এই জমকালো আওয়াজ। তাই তাঁর কবিতার ছন্দ থেকে বুদ্ধদেব বসুর মতো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে হঠাৎ, এ যেন 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।'

কূলভাঙা কোনো প্রবল জলোচ্ছ্বাস নয়, টলমলে জলের এই নিরর্গল প্রবাহ জীবনানন্দের কবিতাকে সব সময়ে ভিতর দিক থেকে টেনে নিয়ে যায়। তাই তাঁর অক্ষরবৃত্তের একটা লক্ষণ হয়ে ওঠে প্রসারণ, দীর্ঘ বিসর্পণ। চোদ্দ বা আঠারো মাত্রায় আর তিনি বেঁধে রাখেন না নিজেকে, তাঁর অক্ষরবৃত্তের মাত্রা ছড়িয়ে পড়ে বাইশ থেকে ছাব্বিশ, ছাব্বিশ থেকে তিরিশে। এরকম লাইন হামেশাই লেখেন তিনি:

চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ !

অথবা, 'ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ', কিংবা 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর !' যদি ইচ্ছে হয়, আরো চার মাত্রা বাড়িয়ে নিতে পারেন তিনি, লিখতে পারেন : 'পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, কোনো কৃষকের মতো দরকার নেই দূরে মাঠে গিয়ে আর !' আবার, একটু সাহস নিয়ে এও বলা যায় যে কখনো কখনো তিনি সমস্ত পরিমাপ লঙ্ঘন করে বিয়াল্লিশ মাত্রাতেও নিয়ে যেতে পারেন অক্ষরবৃত্তের কোনো লাইন : 'অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা—জানে তাহা নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল।'

কিন্তু এই পর্যন্ত পৌঁছবার পর, এই বিয়াল্লিশ মাত্রার উল্লেখের পর, প্রবল এক আপত্তি উঠতে পারে সঙ্গে সঙ্গে। প্রশ্ন হতে পারে, এ কি বস্তুত একটিমাত্র কাব্যপঙ্‌ক্তি, না কি একাধিক পঙ্‌ক্তির যোগফল শুধু ? আর এই প্রশ্ন একবার উঠে এলে কেবল এই বিয়াল্লিশ মাত্রার চরণ নয়, বাইশ মাত্রা বিষয়েও সন্দিগ্ধ হতে পারি আমরা। বলতে পারি, এ কি সেই পুরোনো ত্রিপদী বা চৌপদীরই একটা চোখ-ভোলানো চেহারা নয় ? ইচ্ছে করলেই কি এসব লাইন ভেঙে আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি না ?—

চোখের সকল ক্ষুধা   মিটে যায় এইখানে
এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান

কিংবা,

হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে
শেষ ঝরা মেয়ে তার
শাদা মরা শেফালীর
বিছানার পর ।

আর এইভাবে সাজিয়ে নিলে, সঙ্গে-সঙ্গেই কি ধরা পড়ছে না যে এসব হলো বাংলা কবিতার নিতান্তই অভ্যস্ত এক প্রথা মাত্র? উঁকি দিচ্ছে না কি এখানে পুরোনো সেই চেনা চেহারাটাই একেবারে?

নিতান্ত কাঠামোর দিক থেকে যদি ভাবি, কথাটা তাহলে সত্যি। একথা সত্যি যে জীবনানন্দের কোনো কোনো চরণ হয়তো কয়েকটি পদের বা কয়েকটি চরণের সমাহার মাত্র। তাহলে জীবনানন্দ এখানে যা গড়ে তুলছেন তা বড়ো রকমের নতুন কোনো ব্যাপার নয়। তিনি কেবল ভেঙে দিচ্ছেন আমাদের চাক্ষুষ অভ্যাসটুকু।

কিন্তু এইটেই আমরা এখানে বলতে চাই যে পঠনীয় কবিতার জগতে চাক্ষুষ এই অভ্যাসের মূল্য খুব কম নয়। চোখ যে এখানে কানকে কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রিত করে না, এটা ভাবলে ভুল হবে। জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায় যে অনেকসময়ে 'চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ', চোখের দেখায় পালটে যায় ছন্দের ধ্বনি। তিরিশ মাত্রার একটি পঙ্‌ক্তি চৌপদীতে সাজিয়ে নিলে যেভাবে পড়ব আমরা, আর এক-লাইনের টানাপ্রবাহে তাকে দেখলে যে ধ্বনি পৌঁছবে আমাদের কানে—এর মধ্যে মস্ত একটা ভিন্নতা আছে নিশ্চয়। ত্রিপদী বা চৌপদীর বিন্যাসে মধ্যবর্তী যে যতির অংশ, তা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসে টানা-লাইনের প্রবাহে, অনেকটা কাছাকাছি লেগে থাকে তার অন্তর্গত টুকরোগুলি, আর এইভাবে তৈরি হয় একটা লতায়িত একতান: 'পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।'

উদ্ধৃত এই লাইনটি থেকেই আরো একটি সূত্রের ইঙ্গিত পেয়ে যাই আমরা। ধ্বনির প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখতে পাব যে এই লাইনটির অন্তর্গত অনেকগুলি শব্দই শেষ হচ্ছে নিঃস্বর ব্যঞ্জনে, আর তাই, পূর্বতন স্বরের উচ্চারণে অনিবার্য টান লাগছে অনেকটা। 'সুর' আর 'সুরে' শব্দদুটির 'উ'-উচ্চারণ যে ঠিক এক-মাপের নয়, সেটা নিশ্চয় ধরতে পারি আমরা? এইভাবে, এই একটি লাইনের মধ্যে, স্বরের

প্রসারণ ঘটছে বারবার : -গাঁর, আজ, রূপ, ধান, -স্তীর, -বের, ভ্রাণ। আর এই প্রসার তার সঙ্গে নিয়ে আসছে একটা টানা আবেশ। কেবল এই একটি লাইনেই নয়, এই ধরনটা জীবনানন্দের কবিতায় কেবলই দেখা দেয়, যার অন্যতম একটি সুন্দর উদাহরণ আমাদের সবারই খুব জানা :

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।

আটাশটির মধ্যে এর উনিশটি শব্দই শেষ হলো ব্যঞ্জনের ধ্বনিতে। না বললেও নিশ্চয় চলে যে এই ধরনের শব্দ সব কবিরই পদ্যপঙ্‌ক্তিতে অল্প-বিস্তর মিলবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে জীবনানন্দের রচনায় এর বিতরণ একটু বেশি, আর এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতায় দেখা দিচ্ছে স্বরের বিস্তীর্ণ আধিপত্য। এই আধিপত্য একদিকে যেমন স্বরের প্রসারণ ঘটায়, অন্যদিকে তেমনি স্বরসমন্বিত করে কোমলতা দিতে চায় ব্যঞ্জনকে। আর সেই কোমলতারই প্রবর্তনায় যুক্তব্যঞ্জনকে সে ভেঙে দিতে চায় অনেকসময়ে, আলগা করে নিতে চায় তার ধ্বনিসংঘর্ষ। একটা পর্ব ছিল জীবনানন্দের রচনায়, যখন যুক্তবর্ণ তিনি ব্যবহারই করেছেন কম, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পরেই বুদ্ধদেব লক্ষ করে-ছিলেন এই তথ্য। তিনি দেখেছিলেন যে যুক্তবর্ণের স্বল্পতাই কবি এমন-ভাবে আনেন যাতে 'পয়ারে লেগেছে নতুন সুর'। কিন্তু প্রথম পর্বের সেই যুক্তবর্ণের স্বল্পতা নিয়ে চলল না বেশিদিন, অভিজ্ঞতার বৃত্ত বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের জটিলতাকে আরো ব্যাপকভাবে ধরতে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর প্রয়োজন হলো শব্দের এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে দেওয়া। তবু তখনো, যুক্তবর্ণ ব্যবহার করবার সেই মুক্ত সময়েও, জীবনানন্দ প্রায়ই এর ধ্বনিকে করে নেন শমিত, তাঁর প্রয়োগে এই যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয়ে যায় অনেকটাই বিশ্লিষ্ট।

অক্ষরবৃত্তের স্বভাবেই আছে সংশ্লেষণ, এইরকম আমরা জেনেছি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন এই ছন্দের শোষণক্ষমতা, তার প্রতাপ যে কতদূর তা আমরা দেখেছি। আজ অক্ষরবৃত্তের সহজ প্রবণতাই হলো এই শোষণে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' ছাপা হবার পর এ-ছন্দের ধ্বনিধারণশক্তি বেড়ে গেছে আরো অনেক, আমরা তা জানি। কিন্তু এর পাশাপাশি জীবনানন্দ চললেন একেবারেই উলটো এক পথে, তাঁর অক্ষরবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জন কেবলই বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়তে চায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও যে এর উদাহরণ ছিল না তা নয়, কিন্তু এই অভ্যাস তাঁর বাড়তে থাকে পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছে, আর তখন থেকে এইটেই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর অনায়াস ছন্দ-রীতি। অক্ষরবৃত্তে তাঁর কাছে খুব স্বাভাবিক হয়ে আসে এইসব লাইন : 'ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে' বা 'ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' কিংবা 'পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন'। তার মানে অবশ্য এ নয় যে এই ধর্ম রৌদ্র বা কর্মের মতো অন্য যে-কোনো যুক্ত-ব্যঞ্জনমাত্রেই ভেঙে পড়ে তাঁর রচনায়, আসলে তিনি চান এপাশ-ওপাশ ফিরবার সহজ স্বাধীনতাটুকু। তাই : 'আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়' লিখবার পাশেই তিনি বলতে পারেন 'প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে'। একই শব্দকে পাশাপাশি ভিন্ন মাত্রামূল্যে সাজিয় নিতে এখন আর কোনো অসুবিধে নেই তাঁর।

আর, এই তিন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তৈরি হয় তাঁর সেই 'সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা', ছন্দ-বলয়ে দেখা দেয় সেই 'সুদূরতা ও নির্জনতা', যার দেখা পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এরই মধ্য দিয়ে ছন্দ-দেহে তিনি ছড়িয়ে দিতে পারেন এক আলস্য আর মন্থরতার বোধ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কেন তা ছড়িয়ে দেবেন কবি। এই আলস্য কি কবিতাকে জীবনবিমুখ করে তুলবারই এক সচেতন আয়োজন মাত্র ?

কবিতা নিয়ে যখন কথা বলেন জীবনানন্দ, বারে বারেই তখন তিনি ফিরিয়ে আনেন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার। আভা বা অন্তঃসার বা প্রতিভার মতো শব্দাবলি। প্রতিভা শব্দটিকে তার অভ্যস্ত অর্থে এখানে আনেন না তিনি, শব্দটিকে তিনি যুক্ত করে নেন অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে, হয়তো বলেন ভাবনাপ্রতিভা বা কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা। এইসব শব্দে, অথবা 'সারাৎসার' কিংবা 'চিরপদার্থে'র মতো ধারণায়, জীবনানন্দ কেবলই লক্ষ্যে আনতে চান প্রত্যহের অতীত একটা ভূমিকে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে প্রত্যহকে এড়িয়ে যান তিনি ; প্রতিদিনকে তিনি দেখতে চান তার সামগ্র্যের পটে, তার গাঢ়তর বোধে। সেই-জন্যেই পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়েও নতুন এক জলেরই কল্পনা করতে চান তিনি, সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে নতুন এক দীপের কল্পনা করেন। তখন তিনি দেখতে চান কেবল জল নয়, তার জলত্ব ; দীপ নয় শুধু, তার দীপতা। আর এইটে দেখবার জন্যেই তাঁর দরকার হয় গোপনীয় এক সুড়ঙ্গের। এই সুড়ঙ্গ থেকে সমস্ত জীবনের চারপাশে তিনি বিভান্বিত দেখতে পান আরো একটা অন্তর্মণ্ডল, সেইটেই হয়ে ওঠে জীবনের আভা, তার সারাৎসার, তার চিরপদার্থ। আর তখন : 'বস্তুসংগতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়।'

জীবনের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্কের কথা যখন বলেন জীবনানন্দ, তখন তিনি যোগ করে দিতে ভোলেন না 'সম্পূর্ণ' বিশেষণটিকে। জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে তার কোনো ভগ্নাংশের সঙ্গে লীলা তৈরি করে না এই সুড়ঙ্গ, এ নয় কেবল অধোজাগতিক চেতনার পন্থা, কেবল অবক্ষয়জাত ক্লান্তি মনে করবার কারণ নেই একে। দিন-যাপনের যে পরিচিত প্রবাহ চলছে, তার থেকে অল্প সরে আসার

ভঙ্গি আছে বটে এখানে, কিন্তু সে কেবল এক আত্মপট তৈরি করে নেবার আয়োজনে : খুব কাছ থেকে ধরা যায় না পরিপ্রেক্ষিত,' তাই বলতে চান কবি : 'আজকের এটা ওটা সেটার খুব কাছে আমরা, ঠিক ; কিন্তু খুব শিগগিরই ওগুলো ছড়িয়ে পড়ে, সরে যায়, সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ আজকের সাথে মিশে গিয়ে বর্তমানকে স্পষ্টতর ভাবে গঠন করে।' খানিকটা তাই সরিয়েই নিতে হয় নিজেকে, একটু দূরে। আর এই সরে আসাটাই এমন এক সুড়ঙ্গপথ হয়ে দাঁড়ায়, যেখান থেকে বর্তমান মুহূর্তও জেগে ওঠে স্মৃতি আর আকাঙ্ক্ষার মিলনবিন্দু হিসেবে, অতীত আর ভবিষ্যতের মিলনবিন্দু। কেবল তখনই আমরা খুঁজে পাই মানবস্বভাবের সেই শুদ্ধতা, যার কাছে এসে পৌঁছলে

আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় এমনিভাবে অন্তর্দীপ্ত হবার সময় নেন অনেকটা। আর সেইজন্যেই তিনি রচনা করে নেন আপাতমৃত্যুর একটা আচ্ছাদন, আলস্যের এক আভা। অন্তর্দীপ্ত হবার সময় নেন অনেকটা, তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'মহাপৃথিবী'তে বইতে থাকে আবহমান কাল, এই তার আভা নিয়ে। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমির' থেকে কবির শেষ লেখা পর্যন্ত দেখা দিতে থাকে আরেকটা জগৎ! এই দুই জগতে যে মৌলিক কোনো ভিন্নতা আছে তা অবশ্য নয়, দুয়েরই মধ্যে আছে আবহমানের টান, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে দেখা দিচ্ছে আমাদের 'জানুহীন মলিন সমাজে'র রূঢ়তা, তার সমস্ত ক্ষয় ধিক্‌কার আর প্রত্যাশার আবেগ নিয়ে। সময়ের কোনো-এক বিন্দু থেকে, পৃথিবীর কোনো-এক প্রান্ত থেকে, চিরসময়কে মহাপৃথিবীকে কবি দেখেছিলেন একদিন ; আর আজ সেই চিরসাময়িক মহাপৃথিবীর বিস্তার থেকে কেবলই তিনি ফিরে তাকাতে চান এই শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে। এটা আকস্মিক নয় যে শতক বা শতাব্দীর মতো

শব্দগুলি আবর্তিত হতে থাকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' জুড়ে, সূর্যাস্তের অন্ধকারে এখানে তাঁর মনে হতে থাকে 'এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।'

কিন্তু শতাব্দীকে যিনি দেখছেন তাঁর ইতিহাসযান থেকে, তিনি কি কেবলই এই আঁধারের কথা বলবেন আবার? সাম্প্রতিকের সমস্যায় পৌঁছে তবে কি তিনি মলিন হয়ে এলেন আবার? তা নিশ্চয় নয়, কেননা এখন আমরা জয়ধ্বনি শুনতে পাব অনেক, জানুহীন সময়ের পাশেই কবিচেতনায় দেখতে পাব অনেক দেবদারুর উত্থান, সময়ের কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে শেষপর্যন্ত 'আছে।আছে আছে' এই বোধির ভিতর থেকে কবি উচ্চারণ করবেন এখন: জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়। কিন্তু এইটেই জীবনানন্দের চরিত্র যে তাঁর এই জয়ধ্বনি ভিতরে ভিতরে রেখে দেয় এক ক্ষান্তিহীন ভীতিশব্দ; আবার অন্যদিকে, নিখিল বিষের মধ্যেও তিনি টের পান একরকম অনিঃশেষ মধুরতা। কবি জানেন যে 'জীবনের মানে: সকলের ভালো করে জীবনযাপন', আর যদিও তেমন শুভ যাপনের জন্য অনেক অপেক্ষা এখনো বাকি, তবু আজও 'অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের।' মানুষ নত হয়নি, অনবনমনে চলছে মানুষ 'অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে।' এই চলাও সত্যি, ভালো করে জীবনযাপনও একদিন হয়তো করতে পারবে সবাই, কিন্তু থেকে যাবে তবু একটা অন্তর্জগৎ, যেখানে

> ভীতিশব্দ রীতিশব্দ মুক্তিশব্দ এসে
> আরো ঢের পটভূমিকার দিকে দিগন্তরে ক্রমে
> মানবকে ডেকে নিয়ে চলে গেল প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে।

তাই, থেকেই যায় তাঁর জীবনের সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গলালিত গোপন সম্পর্ক। মুহূর্তের ইতিহাসকেও যখন তিনি ধরেন তাঁর কবিতায়, তখনো তাঁর চারপাশে তাই এসে যায় ওই একই আভার ঢেউ, একটানা সেই মন্থরতার আচ্ছাদন তখনো তাই দরকার হয় তাঁর।

কিন্তু ইতিহাস খুঁড়ে এর মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে নানা জলঝরনার ধ্বনি, 'মানিকতলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের এণ্টালির' হানিফ মহম্মদ মকবুল অথবা গগন বিপিন শশীদের জীবন। এই বস্তুসংঘাতের নতুন মুহূর্তে জীবনানন্দ তাঁর পুরোনো ছন্দ যে ছেড়ে দিলেন তা নয়, কিন্তু ওবই সঙ্গে তাঁব হাতে পৌঁছল আরো একটি ছন্দ : এল স্বরবৃত্ত। নতুন এই ছন্দে তিনি দেখতে চাইলেন কী ভাবে আজ 'প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো' ছড়িয়ে আছে, অথবা কীভাবে 'ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে।' এই অন্ত্যপর্বে জীবনানন্দ স্বরবৃত্তে লিখলেন প্রায় তিরিশটি কবিতা আর এই স্বরবৃত্তও—তাঁর অক্ষরবৃত্তের মতোই—নিয়ে এল ভিন্ন এক স্পন্দন। অনেকদিন আগে, 'ঝরা পালক' যখন লিখছিলেন কবি, তখন তাঁর অভ্যাস ছিল স্বরবৃত্তের উল্লাসে। কিন্তু সে ছন্দে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব ছিল না কোনো, যে-কোনো কবির মতোই সেখানে তিনি বলতে পারতেন :

সর্বনাশের সঙ্গে তোরা দম্ভে খেলিস পাশা
হেথায় কোন্-এক সৃষ্টিপ্রাতের সূত্রপাতের ভূমি,
শিশু মানব গড়েছিল ঐ সাহারায় বাসা
সেসব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁয়ায় ধুমি।

কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে এ-ছন্দ তাঁর নয়, তাই এর পর দীর্ঘকাল তাঁর রচনায় এর চিহ্নমাত্র দেখতে পাই না। আবার যখন এর দেখা মিলল, 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়, তখন তিনি এক নতুন সংঘাতকে ধরতে চাইছেন তাঁর রচনায়। তখন এই ছন্দ এল ফিরে, এই তরঙ্গসংঘাতময় ছন্দ, কিন্তু এর দুলকি চালটা কবি সরিয়ে নিলেন আলতো করে, স্বরবৃত্তও হয়ে উঠল তাঁর অক্ষরবৃত্তের মতোই মন্থরতাভরা। এই দুই ছন্দের একটা সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা কখনো কখনো দেখা দিয়েছে বাঙলা কবিতায়, সামান্য পরিমাণে। স্বরবৃত্তের পর্বে পর্বে জোড় বেঁধে দিয়ে, অথবা চতুঃস্বরের

সীমানা ডিঙিয়ে, অথবা তিনের বেশি রুদ্ধদলকে এক-পর্বের পরিধিতে টেনে এনে, খুলে দেওয়া যায় সেই সম্ভাবনার পথ। তেমনি একটা দিকেই এগিয়ে নিচ্ছিলেন জীবনানন্দ তাঁর স্বরবৃত্তকে। আর সেইটে মনে রেখে, পর্বের ঝোঁককে শমিত রেখে, যদি টানা প্রবাহে পড়তে পারি তাঁর এই ছন্দ, তবে আমরা সহজেই ধরতে পারব এই ধরনের পঙ্‌ক্তির সংগতি :

কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো

অথবা,

ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার, —নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে সণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর!

তখন আমরা বুঝতে পারব যে এই স্বরবৃত্তের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ একই সঙ্গে তৈরি করতে পারেন তাঁর গহন বোধের সারাৎসার, তাঁর চিরপদার্থ, আর তাঁর মৌখিক ভাষার দৈনন্দিনতা। মুখের ভাষাকেও এমন একটা অবয়ব দেন তিনি, যেন তা ঠিক মুখের ভাষা নয়, কেননা কাছে নিয়েও আমাদের অল্প সরিয়ে রাখতে চান তিনি, ভিতরের নিবিষ্টতাকে জেগে উঠবার সময় দেবার জন্য।

এ-যুগের উপযোগী এক কাব্যছন্দের ব্যবহার হয়তো জীবনানন্দও চেয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই যুগোচিত কাব্যছন্দ? কীভাবে তিনি বুঝে নেবেন তাঁর যুগকে? কোনো অলীক আশাবাদের উত্তেজনায় তাঁর ভরসা নেই একেবারে, কোনো হেতুহীন উল্লাস নয়, আবার 'যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে' দ্বীপ বানিয়ে বসে থাকাতেও তাঁর স্বস্তি নেই কোনো, এর প্রতিও জেগে ওঠে তাঁর ধিক্‌কার। কিন্তু তিনি দেখতে পান যে আজ এ-দুয়ের মধ্যে কেবলই চলছে দেওয়া নেওয়া, এ-দুয়ের মধ্য থেকে অল্পে অল্পে জেগে উঠছে তাঁর স্বপ্নজগৎ। তারই শব্দ শোনেন কবি 'পাতা পাথর মৃত্যু কাজের

ভূকন্দরের থেকে', আর তখন একটা করুণাময় আচ্ছাদন তৈরি হয় তাঁর সমস্ত চেতনার উপর। সবই তিনি দেখেন ওই ভূকন্দরের থেকে, তাই এই আচ্ছাদনই হয়ে ওঠে জীবনানন্দের ছন্দ, এই হলো তাঁর কাছে এ-যুগের কাব্যছন্দ। ইতিহাস খুঁড়লেই আমরা দেখতে পাব রাশি রাশি দুঃখের খনি, কিন্তু তবু তাকে ভেদ করে শোনা যায় শত-শত 'শত জলঝরনার ধ্বনি'। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়, কবিতার প্রতিমুহূর্তে, একই সঙ্গে ধরে রাখেন এই দুঃখ আর শুশ্রূষা, এই আশা আর ক্ষয়, এই অদ্যতন আর চিরন্তন। একই সঙ্গে জীবনের হাজার লাঞ্ছনা আর নিবিড় জয়ের অনুভব ধরে আছে তাঁর কবিতা, কিন্তু 'প্রসিদ্ধ প্রকট ভাবে' নয়, ধরে আছে যেন মর্মের মধ্যে, মজ্জায় মজ্জায়। আর এই ধারণের জন্যই তাঁর দরকার হয় এমন এক গূঢ় ছন্দ, মুখের উচ্চারণ থেকে যা খুব দূরের নয়, প্রতিদিনের সন্নিহিত যা, কিন্তু তবু এক আপাত-আলস্যের মন্থর ভারে যাকে মনে হতে পারে যেন অনেক দূরের, যেন প্রতিদিনের স্পর্শ-হীন কোনো অবিরল স্রোতস্বল জলধারা।

১৯৭৪

ছন্দশাসন এবং সুধীন্দ্রনাথ

> 'অগত্যা কাব্য আজ খামখেয়ালী ; কবির স্বকীয়তা এখন শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারের ভেক পড়েছে, ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে সম্প্রতি আঁকড়ে ধরেছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে।······আমার বিশ্বাস নৈরাত্ম্যরীতিতেই বিশ্বসাহিত্যের ঐক্যসূত্র অনুসন্ধানীয়।' [মনুষ্যধর্ম]

এরা যখন কবিতা লিখতে শুরু করছেন মাত্র—এই আধুনিক কবিরা—'পরিচয়' পত্রিকার সদ্য আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এলিয়ট-অনুবাদ এবং 'শিশুতীর্থ'র মতো রচনাবলি নিয়ে তখন পরীক্ষা করছেন আপন ধরনে। বাঙলা কবিতার আঙ্গিকে তখন এক নবীন উত্তেজনা, এবং তরুণদের বিস্ময়ের সামনে সেটা ঘটাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। অন্ততপক্ষে ছন্দের জগতে যে মুক্তির ইচ্ছে সমকালীন জীবন-মুক্তির প্রতিমান রূপে গড়ে উঠতে চাইছিল, তার প্রথম স্পষ্ট চেহারা রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দেই দেখা দিচ্ছে। সেখানে পুরোপুরি সফলতার চিহ্ন প্রথম মুহূর্তেই ধরা না গেলেও তার সম্ভাবনা হয়ে উঠছে স্পষ্ট।

আজ অবশ্য ভেবে দেখতে হবে, নতুন এই প্রকরণকে কতটা মনে করা হচ্ছিল নিছক কলাকৌশল, অভ্যাস অতিক্রম করবার অন্যতম উপায়-মাত্র, আর কতটাই-বা এর লক্ষ্যে ছিল মুক্তির অথবা অভ্যন্তরীণ অনিবার্যতার বোধ। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক বলেছিলেন গদ্যছন্দের প্রয়োজন বিষয়ে। কিন্তু অনেক সময়েই আমরা তাঁর যুক্তির ন্যায়ে ভরসা রাখতে পারি না। তাঁর দেওয়া যুক্তিতে বোঝা যায় না যে 'পলাতকা' যদি ছন্দে সম্ভব, 'পুনশ্চ' তবে নয় কেন। তরুণতররাও তাঁদের গদ্যছন্দে আসলে রবীন্দ্রনাথকেই বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিলেন অনেকদিন পর্যন্ত। যখন তাঁরা গদ্যে লিখেছিলেন, তখন নিজের আগ্রহে তাকে আবিষ্কার না করে অনেকটা যেন রবীন্দ্র-

ধরনকেই দেখতে চেয়েছিলেন প্রকারান্তরে, অন্তত প্রথম কিছুদিন। যেমন : বিষ্ণু দে তাঁর নিজস্ব এলিয়ট-অনুবাদ পাঠিয়ে দেন কবির কাছে, অনুরোধ করেন সেটিকে গদ্যছন্দে ধরিয়ে দিতে, যাতে ও-ছন্দের ব্যাপারটা তিনি ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারেন।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর খানিকটা পরিণত বয়স এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে তখনই ধরতে চেয়েছিলেন এই ছন্দের কাব্যগত সংগতি। 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বছরেই 'কাব্যের মুক্তি' নামে তাঁর যে স্মরণীয় রচনাটি ছাপা হয়, তার অন্তর্গত 'মুক্তি' শব্দটি নিছক শিরোভূষণ ছিল না। আধুনিক কবিতার সেই সূচনামুহূর্ত থেকেই এই কবি দেখতে পাচ্ছিলেন কবিতার পালাবদল এবং তাঁর আলোচনায় বারবার ঐ শব্দটি আসছিল গূঢ় তাৎপর্যে। জীবনের একেবারে জটিল মধ্যভূমি থেকে কবিতার জগৎ তৈরি করবার প্রয়োজনে 'সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্যপদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন' বলে মনে করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। তিনি ভাবছিলেন যে, কবিতাকে জীবনের দিকে এগিয়ে নেবার ক্রমিক পদ্ধতি হিসেবেই আধুনিক কবিতা বা আধুনিক ছন্দের মুক্তিসন্ধান। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দোমুক্তির এই আগ্রহ তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম, স্পষ্ট এবং বিশদভাবে যে সুধীন্দ্রনাথই বুঝেছিলেন, তাঁর সে-যুগের প্রবন্ধাবলি এর ভালো প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিচারে এলে সুধীন্দ্রনাথ প্রধানত বলেন এর ছন্দের কথা, বাঙলা ছন্দের মূল সূত্র নির্মাণের প্রথম যুগেই অভিনন্দন জানান অমূল্যধনকে, মাত্রাবৃত্তের মতো রাবীন্দ্রিক ছন্দকেও বিষ্ণু দে প্রগাঢ় আত্মতায় ব্যবহার করতে পারেন বলে গৌরব দেন তাঁকে অথবা প্রথম সংখ্যা 'পরিচয়'-এ সিটওয়েল আর ফ্রস্টের নব-প্রকাশিত কবিতা-বইয়ের আলোচনাতেও নিয়ে আসেন তিনি ছন্দ-প্রসঙ্গ। ছন্দ বিষয়ে তাঁর এই অতি-আগ্রহকে মনে করা উচিত আত্ম-আবিষ্কারের একটা প্রক্রিয়া। আধুনিক কবিতার সঙ্গে তাঁর আপন সম্পর্ককে বুঝে নেবার দায়িত্বেই ছন্দভাবনাকে এতটা গুরুত্ব

দিচ্ছিলেন তিনি। আমরা লক্ষ করব তাঁর এই কথা: 'আমার নাতিক্ষুদ্র জীবনের অনেকখানি পদ্যলেখার ব্যর্থ চেষ্টায় কেটেছে বলে আমি মানসীর আঙ্গিক বিচারে এতটা সময় দিলুম'। এতে বোঝা যাচ্ছে, কবিতার আঙ্গিকভাবনার এই প্রয়োজন ছান্দসিকের নয়— নিতান্তই কবির। সেই কারণেই তাঁর ছন্দ-আলোচনা ছন্দের নন্দন-ভাবনার সঙ্গে জড়ানো; সেটা নিছক ছন্দসন্ধিৎসুর ব্যাকরণ-বিশ্লেষণ নয়।

এই রকমই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখনই অন্য একটি যুক্তি-সংগত মৌলিক প্রশ্ন ওঠে: আঙ্গিকের এই নব্যতা সুধীন্দ্রনাথ নিজে কতটা ব্যবহার করেন তাঁর কবিতায়? তত্ত্বভাবনার দিক থেকে যিনি আধুনিক ছন্দে বা কবিতায় মুক্তির খোঁজে অভ্যস্ত, তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি-কর্মে সেই মুক্তির পথটা কী রকম?

এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ালে একটু বিচলিত লাগে। সেটা কেবল এজন্য নয় যে সমস্ত জীবনে কখনো তিনি গদ্যছন্দের ব্যবহার করেননি। গদ্যছন্দই যে ছন্দোমুক্তির একমাত্র পরিমাপক, একথা কে বলে। কিন্তু তাঁর নিজের কবিতায় ছন্দকে মুক্ত দেখবার কোনো আগ্রহ কি তিনি বোধ করেছিলেন? বাক্‌ছন্দের ব্যবহারেই বা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর ছিলেন তিনি? প্রাথমিক সেই তিরিশের কাল থেকে অন্ত্যজীবন অবধি এ-বিষয়ে তাঁর এগিয়ে আসবার ধরনটা ঠিক কী রকম? গদ্যছন্দ পর্যন্ত না পৌঁছেও কি তিনি ওর কাজ করিয়ে নিতে পারছিলেন প্রচলিত ছন্দকেই ভিতর থেকে নানা ভাবে খুলে দিয়ে, যেমন চেষ্টা আছে অমিয় চক্রবর্তী বা বিষ্ণু দে'র রচনায়?

অন্তত প্রথম পর্যায়ে এ প্রশ্নের ভালো কোনো উত্তর মেলে না। তখনকার কবিতায় মনে হয় যে খুলে দেবার চেয়ে যেন তিনি আরো ঘন করেই নিজেকে বাঁধছেন। ভাস্করের গড়নে কুঁদে তুলছেন কবিতা, তার স্থিতির চেহারাটাই প্রধানত চোখে পড়ে এখানে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন যে তাঁর পূর্ণ পক্ষপাত

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, 'তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে'র মতো অতিশয় স্মরণযোগ্য কয়েকটি প্রধান কবিতা মাত্রাবৃত্তে লেখা হলেও তাঁর রচনা-বলির বড়ো আয়োজনই অক্ষরবৃত্তে।[১] তাহলে কি অক্ষরবৃত্তেই তিনি মুক্তিপথ ভাবছিলেন? কিন্তু 'সংবর্তে'র আগে পর্যন্ত সে অক্ষরবৃত্তেও প্রবহমানতা সঞ্চারের কোনো স্পষ্ট ইচ্ছে দেখা যায় না। ঠিক, কিছু কবিতায় 'বলাকা'র মুক্তবন্ধ ধরন দেখা দিচ্ছে; কিন্তু 'বলাকা' রচনার প্রায় কুড়ি বছর পরে পৌঁছেও সেখানে তার চেয়ে স্বতন্ত্র কোনো cadence ব্যবহার করতে চান না সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতাপাঠে বরং অনেকসময়ে এইটে মনে হয় যে কিছুটা যেন পিছিয়েই আনছেন তিনি ছন্দোমুক্তির সম্ভাবনা।

এর একটা বাইরের প্রমাণ ধরা পড়ে কবিতার ছন্দে তাঁর পঙ্‌ক্তি-একক প্রয়োগের ভঙ্গিতে। তাঁর সমকালীন অন্য কোনো কবি এত সুনিশ্চিত পরিমিত শ্বাসক্ষেপে কথা বলেন বলে আমি জানি না। তাঁর কবিতার আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় ভাবনার শৃঙ্খলায়, সেই শৃঙ্খলারও স্তর আত্মপ্রকাশ করে স্থিরনিবদ্ধ একক পঙ্‌ক্তিতে। এরই ফলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন অন্ত্যযতিবহুল, সমমাত্রিক লাইন-গুলিতে এমন উদাহরণ বিরল যার শেষে আমরা না-থেমে পারি। সনেট অথবা সনেটকল্প রচনায় এই স্থিতিভার হয়তো খানিকটা প্রত্যাশিত, কিন্তু অন্যত্র? যেমন, 'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী': আটাশ লাইনের মধ্যে এর চারটি মাত্র পাই অন্ত্যযতিহীন; অথবা আরো-একটি ধরুন, 'ভবিতব্য': বত্রিশ লাইনে একটিই মাত্র আছে যার অন্তে কোনো চিহ্ন নেই। এবং এ দুটিকে ব্যতিক্রম বা বিরল উদাহরণ মনে করবার কারণ নেই, এইটেই সুধীন্দ্রনাথের অক্ষরবৃত্তে সাধারণ স্বভাব। এই স্বভাবের ফলে তাঁর কবিতা স্তরে স্তরে ঘনতা

১ অনুবাদ কবিতাগুলি ছেড়ে দিলে, সুধীন্দ্রনাথের ১০০টি কবিতার ৭০টি অক্ষর-বৃত্তে লেখা। ৩০টি আছে মাত্রাবৃত্তে, স্বরবৃত্ত ১০টি। 'প্রতিধ্বনি'-বইয়ের হিসেব হলো ৩৮-১৩-৪। 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি অবশ্য বিচিত্র ছন্দের সমবায়।

পায়। পরিমিত সমর্থ শব্দের সমবায়ে এক-একটি পঙ্‌ক্তি-একক, এমনি চার-চারটি লাইনে একটি শ্লোকবন্ধ, কয়েক শ্লোকে একটি পূর্ণ কবিতা। পুরো সংস্কৃত কবিতার অর্থেই শ্লোক কথাটি ব্যবহার্য হলো এখানে। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ক্রমশ যে প্রগলভ প্রকাশ-ভঙ্গি আয়ত্তে এসেছিল বাঙলা কবিতায়, শ্লোকসংহত ভঙ্গিতে তাকে যেন এর বিপরীত দিকেই নিয়ে এলেন সুধীন্দ্রনাথ, অন্তত প্রথম পর্যায়ে।

একথা বলবার উদ্দেশ্য এই নয় যে ছন্দের কোনো নবীন পরীক্ষা কখনোই তিনি করেননি অথবা তাত্ত্বিক হিসেবে ছন্দচেতন হলেও কবি হিসেবে তাঁর বিশেষ কোনো মনস্কতা দেখা যাচ্ছে না ছন্দে। এমন-কী প্রথম যুগেই বাইরের খুব স্থূল প্রমাণ হিসেবে মনে পড়ে তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কবিতা, যেখানে স্তবকে স্তবকে বিচিত্র ছন্দের চর্চা আছে। 'ত্রিবিধ উপলব্ধি'র প্রকাশে এখানে তিনি ব্যবহার করেন বাঙলার ত্রিবিধ ছন্দই এবং তারও মধ্যে আছে নানা রকমের হেরফের। এসব ক্ষেত্রে ছন্দের চটক যে একেবারেই তাঁর মনে ছিল না তা হয়তো নয়। 'স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে' স্পষ্টই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্দাক্রান্তা মনে করিয়ে দেয় এবং 'পিঙ্গল্‌ বিহ্বল্‌ ব্যথিত নভতল' যে তাঁকে ভালোভাবেই মাতিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখি 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে এর সশ্রদ্ধ উল্লেখে। সেখানে তিনি উদ্ধৃত করেন সত্যেন্দ্রনাথের এসব লাইন এবং এর 'শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং ছন্দের শোভনতা'র প্রশস্তি করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'অর্কেস্ট্রা'র ছন্দ-বৈচিত্র্য কেবল চাতুর্যের খেলা মাত্র নয়, তা ভাবানুষঙ্গবাহীও, বলতে গেলে কবিতার প্রয়োজনেই তা আসে। এমন-কী 'সপ্ততুরগরবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরান্তে'র মতো প্রত্ন-মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগকেও অসংগত লাগে না, সহসা-আবির্ভাবের মহিমাকে চিনিয়ে দিতে এই সংস্কৃত উচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘ টান বরং সাহায্যই করে আমাদের। ঠিক এই ধরনের ছন্দ-ক্রীড়া—সুধীন্দ্রনাথ আগেপরে কখনোই আর করেননি।

অশ্বারোহী যেন তাঁর বাহনের সমস্ত গতিবেগে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছেন এখানে।

কেবল এইখানে নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তাঁর ছন্দ ভিতর থেকেও খুলে যাচ্ছিল অল্প অল্প করে। তাঁর প্রথম যুগের পরীক্ষা যেন স্থিতির পরীক্ষা, আত্মস্থ সংহতির প্রয়োজনে শ্লোকবন্ধে ফিরে যাবার এক দুঃসহসিক চর্চা। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে শুরু হলো প্রত্যাশিত মুক্তির ভাবনা, যদিও খুব ধীর চালে। 'সংবর্তে'ই দেখতে পাই শ্লোকের ধবন যাচ্ছে সরে, সনেট বাদ দিলে এ-বইয়ের একটিমাত্র অক্ষরবৃত্তে আছে স্থিতিসংহতি এবং এ-বই থেকেই দেখা দিচ্ছে 'ভেলা আমি ভাসিয়ে-ছিলুম একদা তাদেরই মতো' অথবা 'সবই দেখেছিলুম আমিও, না দেখে দেখেছি/বলে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার/পরে' ইত্যাদির মতো সাহসিক বাক্‌স্পন্দের সঞ্চার। প্রায় সমকালে প্রস্তুত মালার্মের অনুবাদ ('ফনের দিবাস্বপ্ন') এ বিষয়ে তাঁর অভ্যাসকে পরিণত করে তুলছিল মনে হয়। আর, 'দশমা'র 'তীর্থ-পরিক্রমা' বা 'প্রত্যুত্তর' কবিতা-দুটিতে পৌঁছে তাঁর মৃত্যুকে মনে হতে থাকে খুবই অকালমৃত্যু, মনে হয় এই অসম্পন্ন পরীক্ষার একটি পুরো চেহারা হয়তো ধরতে পেতাম তাঁর পরিকল্পনার আকস্মিক অবসান না ঘটলে, ছন্দ নিয়ে যেন আরো কিছু করবার ছিল তাঁর।

ঐ দুটি কবিতাই আঠারো মাত্রার পয়ারে সাজানো ('পয়ার' এখানে ছন্দের আকৃতি অর্থে): একটি অক্ষরবৃত্তে, অন্যটি স্বরবৃত্তে। 'ভূমা' বা 'ভ্রষ্টতরী'র মতো কবিতাবলি বুঝিয়ে দেয় যে এখনো তিনি তাঁর সাবেকি শ্লোকের চাল ছাড়তে চান না পুরোপুরি, কিন্তু ওরই সঙ্গে 'প্রত্যুত্তর'-এ দেখতে পাই বাক্‌স্পন্দ ব্যবহারের প্রায় যেন পালোয়ানি কৌশল :

আপত্তি সে তোলে
তখন,/জোয়ার ভাঁটার মতো/টান জোগানোর নিয়ম ওতপ্রোত/
শিরায় শিরায় জানি,/কিন্তু ডাকায় কেবলই বান, পূর্ণিমা কি

অমোঘ দৈববাণী/রটায় না সেই সঙ্গে হঠাৎ অবাক প্রাণে
প্রাণে/এবং যদি মানি কটাল আনে/কাদার গাদাই, তবু/
নিশ্চয়ই সে নেহাৎ জবুথবু,/পাঁকের কাছে গচ্ছিত যে,
উৎস গেছে ভুলে/সমুদ্রকে ঠেকিয়েছে দিকশূলে।

পালোয়ানি বলছি এই জন্যে যে এই কিছু-বেশি ছ'লাইনের কবিতাংশে আসলে আমরা পাচ্ছি মিত্রাক্ষর স্বরবৃত্তে গাঁথা এগারোটি লাইন (বাঁকা দাগগুলির নির্দেশমতো) এবং সে-লাইনগুলি বানানো হয়েছে পুরোই কথ্য ঢঙে অথচ শেষ পর্যন্ত তাকে সাজিয়ে ভবে নেওয়া হলো আপাত-পয়ারের চেহারায়। এ যেন, 'তীর্থপরিক্রমা'র মতোই, 'বলাকা'র অসমান লাইনগুলিকে আবার লেখা হলো সমান মাপের পয়ারসাজে। রবীন্দ্রনাথ যদি অসমান করে খুলে নিয়েছিলেন 'বলাকা'র ছন্দকে, সুধীন্দ্রনাথ কেন আবার তা ফিরে বাঁধতে গেলেন? তাঁর প্যাটার্ন-অনুরাগী মনেরই কি এই এক চিহ্ন নয়? আধুনিক কবিতার লাইনে যদি আমরা অর্থ-অতিরিক্ত আর কোনো পদ্যযতির আশা না করি, তাহলে কেন এখানে সমমাত্রিকতার প্রতি সুধীন্দ্রনাথের এই নিষ্কারণ আকর্ষণ? 'ছন্দোমুক্তি যদিচ সাম্প্রতিক কাব্যের মূল সূত্র', এটি তাঁরই বলা কথা; তাহলেও বহির্বিচারে কেন মনে হয় যে, সুধীন্দ্রনাথ এই মুক্তির প্রতি ততটা অনুরাগী নন, যত আগ্রহের চিহ্ন আছে তাঁর অন্যান্য বন্ধুর রচনায়? কেন তেমনভাবে খুলে যায় নি তাঁর ছন্দ?

এর একটা গৌণ কারণ হয়তো এই যে কবি প্রথম যুগে ভেবেছিলেন: অক্ষরবৃত্তে নবীন সম্ভাবনার অবসান ঘটে গেছে, তার থেকে নতুন স্বর বাজানো যাবে কেবল তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে। পরিবর্তে মাত্রাবৃত্তে পূর্ণ নির্ভরও সম্ভব নয়, কেননা এ ছন্দের 'যতিপাতে ব্যক্তিগত নির্বাচনের সুযোগ নেই', সে-অর্থে বরং অক্ষরবৃত্ত ভালো। অথচ অক্ষরবৃত্তকে নাকি মধুসূদন এমন এক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন 'যার পরে তার উদ্‌গতি স্বভাবতই অসম্ভব'। এ-লাইন কেমন করে

লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, ভাবতে পারি না। মাইকেলের পর রবীন্দ্রনাথও কি অক্ষরবৃত্তকে আরো বিবৃত করে আনেননি, আরো নমনীয় এবং বিকাশোন্মুখ? এবং রবীন্দ্রনাথের পরেও যে কিছু বাকি ছিল, তা জানা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কাব্যচর্চায়। এসব লক্ষ না করবার একটা কারণ তাঁর এই ভুল সিদ্ধান্ত যে 'বাঙলা আক্ষরিক ছন্দ অযুগ্ম চরণে (!) দাঁড়ায় না'। চরণ কথাটি নিশ্চয় এখানে অন্যমনস্ক স্খলন, মাত্রাই লিখতে চেয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। হেমচন্দ্রের মতো সেকালীন কবি এবং আধুনিক সময়ের অনেক ছান্দসিকের ধারণা অগ্রাহ্য করে এ ছন্দ যে অযুগ্ম মাত্রাতেও দাঁড়াচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথ নিজেও শেষ জীবনে তার কিছু নজির তৈরি করেছেন। অযুগ্মতা এবং পর্ব-পর্বাঙ্গের প্রথাগত ধারণাগুলিকে যত প্রত্যয়ের সঙ্গে সরিয়ে দেবার দরকার ছিল, সুধীন্দ্রনাথের রচনায় ততটা প্রত্যয় দেখা যায় না। ইতস্তত করেছিলেন তিনি।

তিনি করেছিলেন, না কি বলা যায় তাঁর শব্দই তাঁকে দিয়ে এটা করিয়ে নিচ্ছিল? বাক্‌ছন্দের সামনে এসে যে দাঁড়াবেন কবি, তার আগে তো এই মীমাংসা হওয়া দরকার যে তাঁর শব্দ অথবা এমন-কি শব্দোচ্চারণের ভঙ্গিতে কতটাই বাক্‌রীতির সামীপ্য আছে? ইংরেজি এবং সংস্কৃতের বর্ণসংকরে যে গদ্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি, কবিতাও তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। ব্যবহৃত তাঁর শব্দাবলিকে উপযুক্ত আশ্রয় দেবার জন্যেই দরকার ছিল তাঁর অতিনিরূপিত ছন্দের। কবিতায় শব্দ আর ছন্দ পরস্পরের প্রভাবে বেঁচে ওঠে, নির্ধারিত নির্বাচিত রূপ নেয়। সুধীন্দ্রনাথের শব্দ-রীতি সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ-রীতির অন্যতম নিয়ন্তা। তাঁর শব্দের অতি-শৃঙ্খলাই শেষ পর্যন্ত তাঁর ছন্দকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে দেয় না।

মুক্তির পরিবর্তে সংবৃতি এবং পারিপাট্যের প্রতিই তাঁর এই প্রধান অনুরাগ কি তবে সুধীন্দ্রনাথের মনের কোনো অন্তর্দ্বৈধকেই ইঙ্গিত করে? কেননা কবিতার ভাবনায় তো বারংবার এই মুক্তির কল্পনা

করেন কবি, স্বাগত জানান ছন্দোমুক্তি বা কাব্যমুক্তির ইচ্ছেকে। যেমন তিনি নিজেকে মালার্মেপন্থী ঘোষণা করেন অথচ মালার্মের কাব্যাদর্শ সত্যিই তাঁর ব্যবহারে তত আসে না, ছন্দ-প্রসঙ্গেও কি দেখা দিচ্ছে কবির সাধ এবং সাধনার মধ্যবর্তী এমনি কোনো দ্বৈধ? দ্বিরাচার?

তা ঠিক মনে হয় না। মনে হয় এই ছন্দশাসনের অন্তবালেই তিনি কবিতার মুক্তিকে ধরতে চাইছিলেন আর-এক ভাবে। গদ্য-ছন্দের যথোচিত অভ্যর্থনা করেও সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু শুনিয়েছিলেন সতর্কবাণী: 'তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যা মোক্ষ আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত'। এই ভয় যে জেগেছিল কবিব মনে সে কি কেবল এজন্য যে প্রতিভায় তাঁরা তুল্যমূল্য নন? অথবা এইজন্যে যে প্রকৃতিতে এবং স্বরূপেই তাঁরা ভিন্ন, অন্তত ভিন্ন হওয়া উচিত? লক্ষ করি যে নবপ্রবর্তিত গদ্য-আঙ্গিকে গোড়া থেকেই নিরুৎসাহ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে, গদ্য-পদ্ধতিকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করছিলেন বরং প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেব। শেষের এই কবিদের অনুরাগে রোম্যান্টিক প্রবণতা চাপা থাকে না, ব্যক্তির নিরর্গল উৎসারে এঁরা ততটা বাধা বোধ করেন না, যেমন করতে পারেন বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোমুক্তি তাঁর অভিব্যক্তিকে পরমতা দেবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যন্তরীণ কোনো সংবরণের কেন্দ্র তৈরি রাখতে না পারলে অর্জিত হবে না আধুনিকের অভিপ্রেত নৈর্ব্যক্তিক ধ্যান—এই কি ছিল সুধীন্দ্রনাথের মনে? এটা ভাববার বিষয়। হয়তো সেইজন্যেই মুক্তির উচ্ছল পথে সেই মুহূর্তে এগোতে চাননি তিনি, বরং ব্যক্তিবাদের বিপরীত মেরুতে সরাতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতাকে, নিয়ম-শাসিত এক ছন্দ-রূপের মধ্যে। প্রথম যুগেই এর প্রয়োজন ছিল আরো বেশি, কেননা তাঁর কবিতার প্রথম পর্বে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অতিরঞ্জন ছিল, ওর বাইরের চেহারাটা যেন লুকিয়ে নেবার দরকার ছিল কোনো সংগত আবরণের মধ্যে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর ছন্দ সেই উপযোগী আবরণ, তাঁর ধ্বনিবর্ম।

মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার বিষয়ে তিনি নিজেই লক্ষ করেছিলেন এই গোপনীয়তা, দেখেছিলেন কী ভাবে এই ছন্দ ব্যক্তিগত খেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত নয়। তিনি ব্যক্তিগত নির্বাচনই চান, তাই খুঁজে নেন অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু ব্যক্তির খোলা খেলায় স্বেচ্ছাচার নয়, তাঁর অক্ষরবৃত্ত তাই বেশিদূর ভাঙে না; আর, তাঁর দ্বিতীয় প্রধান ছন্দ হয়ে ওঠে নিবাচনের সুযোগহীন মাত্রাবৃত্তই, নিজেকে সরিয়ে নেবার আয়োজনে। ব্যক্তিনির্ব্যক্তির যুগল খেলার রহস্য তাই ধরা আছে সুধীন্দ্রনাথের ছন্দে; এবং এইটে লক্ষ করলে বুঝতে পারি যে দত্ত-কুলোদ্‌ভব আর-এক কবি মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর ধ্রুপদী চারিত্রের সাদৃশ্য একেবারেই ঠিক নয়, বরং উলটো এঁদের ধরন। মধুসূদন একটি স্থিতিময় সত্তাকে ভ্রংশ করে দিতে চাইছিলেন, তারই মধ্যে খুঁজে নিতে চাইছিলেন এক গূঢ় ব্যক্তিগত প্রকাশ, আর সুধীন্দ্রনাথ 'একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা'কে সংহত করে নিতে চেয়েছিলেন কোনো নৈর্ব্যক্তিক পুঞ্জে, ছন্দের অনুশাসনে। বিষ্ণু দে ছাড়া সমকালীন অন্য কবিদের সঙ্গে এইখানে তাঁর ভিন্নতা, তাঁর কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছন্দও চেয়েছিল এক নৈরাত্ম্য-রীতিকে অর্জন করে নিতে।

১৯৬৭

ছন্দের বারান্দা

'আর আমি আজ বন্দী হয়েছি ছন্দোবন্ধনে' : [দ্রৌপদীর শাড়ি]

'আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোটো নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প'—একথা যখন বুদ্ধদেবকে লেখেন সুধীন্দ্রনাথ,[১] তখন 'ছোটো' শব্দটি হয়তো তিনি সৌজন্যবশেই ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক ছন্দের কাঠামোয় যাঁরা চেয়েছিলেন গদ্যপদ্যের বিরোধভঞ্জন, তাঁদের পক্ষে এ নালিশকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করা স্বাভাবিক ছিল না। গদ্যপদ্যের মধ্যবর্তী জরুরি সেই সেতুটিকে একেবারেই কি গ্রাহ্য করেননি বুদ্ধদেব বসু ?

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য আপত্তি তুলেছিলেন কবিতার শব্দ বিষয়ে। 'গদ্য-পদ্যের প্রভেদ ঘোচাতে চাই ভাষার দিক থেকে—উভয় প্রকরণে শব্দ ও বাক্যবন্ধ এক রকম রেখে' এই ছিল তাঁর ঘোষণা। সেইসঙ্গে স্পষ্টই তিনি জানিয়ে দেন যে ছন্দোলিপিতে শৈথিল্য তাঁর একেবারে অনভিপ্রেত। তাহলে ছন্দোলিপির পূর্ণ প্রথানুসরণই কি তাঁর অভিপ্রেত ? এর দ্বারাই পাওয়া যাবে মুক্তির পথ ? তাহলে কি 'দময়ন্তী'র শব্দবিষয়ক ইস্তাহার পড়বার পরেই সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে সংগত ছিল এই অভিযোগের প্রত্যাহার ? কিন্তু 'দময়ন্তী'তেও গদ্যের রীতি নিখুঁত বলে সুধীন্দ্রনাথ অন্তত ভাবেননি।

তার একটা কারণ এই হতে পারে যে বাক্‌স্পন্দ বিষয়ে ছটি অনুশাসন স্থির করে নিলেও ও-বইতে সে-বিধির সম্পূর্ণ অনুসরণ দেখা

---

১ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি গৃহীত হচ্ছে বুদ্ধদেবকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে। দ্র 'কবিতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭।

দেয়নি, হয়তো তার প্রয়োজনও ঘটেনি সর্বত্র।[২] সূত্রগুলি ছিল এই রকম :

১. বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।

২. সাধু ক্রিয়াপদ 'হইবে' 'বলিব' 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।

৩. কাব্যিক ক্রিয়াপদ 'ফুটি' 'চলিছে' 'হতেছে' ইত্যাদিও বর্জনীয়।

৪. কাব্যিক শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট ক'রে চলবো। 'মম' 'তব' 'কভু' 'যেথা' 'মোদের' 'সাথে' 'মাঝে' 'আঁধার' 'সনে' 'যবে' 'মতন' 'পরান' এই ধরনের কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেবো না।

৫. মতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবারে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এসবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তাই বলবো। অধিকরণে তে ('ঘরেতে' 'টেবিলেতে') পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হলেও, কিংবা সেইজন্যেই, প্রাদেশিকতা ব'লে বর্জনীয়।

৬. অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগভীর সাংস্কৃতিক ; সংস্কৃত শব্দ বেশি ক'রে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা

২ এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হবার বেশ কিছু পরে ছাপা হয় বুদ্ধদেব বসুর এই স্বীকারোক্তি : 'দময়ন্তী কবিতার বইয়ের প্রথম সংস্করণে যে-দর্পিত ইস্তাহারটি ছেপেছিলুম…সেই ইস্তাহার বই বেরোবার অনতিকাল পরেই আমাকে লজ্জা দিয়েছিলো।…আমার তখনকার সেই সাধের ইস্তাহারটি পরে আমি কী চোখে দেখেছিলুম তা এতেই বোঝা যাবে যে "দময়ন্তী"র পরবর্তী সংস্করণ থেকে সেটি বর্জিত হয়, এবং আমার কোনো প্রবন্ধগ্রন্থেও সেটিকে আমি স্থান দিই নি।' দ্র কবিতা-পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭।

ছাড়বো কেন ? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না, কেননা ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতিহ্রস্ব' কি 'স্বতঃশ্লথ' বলতে দোষ নেই, কেননা ও-ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনোই ব্যবহৃত হয় না।

'দময়ন্তী'তে এর যে দু-চারটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ বুদ্ধদেব নিজেই বলেন, তার বাইরেও দেখি প্রায়ই ঘটছে এই ধরনের বিচ্যুতি : 'অদৃষ্টের দোষে/বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে/ক্ষত করে,' 'সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথবনে/কাটায়েছি', 'আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ, দুজনের চোখে', 'অতীতের ফুঁ দিয়ে নিবায়ে দেবে সব' 'তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে'র মতো অনেক সাধু বা কাব্যিক প্রয়োগ। বাক্‌রীতিকে যদি মূলত ক্রিয়াপদের দিক থেকে বিচার করি তাহলে মানতে হয় যে 'দময়ন্তী'র পরবর্তী কাব্যচর্চাতেই বরং এ-পথে আরো সিদ্ধার্থ হতে পারছেন কবি, ক্রমশ সরিয়ে দিতে পারছেন বাঙলা কবিতার এই ভাষা-গত পিছুটান।

অবশ্য 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধনার জন্য এই ছটি প্রতিজ্ঞার অন্তর্বর্তী পাঁচটিই যাচাই করতে চাইছে শব্দপ্রকৃতি, কেবল প্রথম সূত্রের অন্বিষ্ট ছিল 'বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি'। এই মৌখিক রীতি নিয়ে ঠিক কী ভাবছিলেন বুদ্ধদেব তা হয়তো আমরা খানিকটা অনুমান করে নিতে পারি। কিন্তু তখন প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ থেকে কতটা নতুন করে তাঁদের ভাঙতে হয়েছিল ? পদ্যকে দিয়েও যে গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথই তা বহুবার দেখিয়েছেন, —আর একথা তো বুদ্ধদেবও আমাদের মনে করিয়ে দেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তেও আমাদের কান পুরো সায় দেয় যে 'দেবতার গ্রাস-এর আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের কথা শুনছি বলেই মনে হয়'। 'দেবতার গ্রাস' এ ব্যাপারে কোনো একলা উদাহরণও নয়। তাহলে শব্দসাজানোর ব্যাপারে এই দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে আর কতদূর পরিণতি ঘটল কবিতায় ? 'কাব্যিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্বাসিত করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিক ভাষার ঠিক ততটাই অনুরূপ হতে পারে, কবিতার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব' : এই কি হবে আমাদের শেষ কথা ? কবিতার পক্ষে কতটা সম্ভব তা কী হিসেবে স্থির হবে ? ছন্দের মধ্যেই চাই কথ্য ভাষার সতেজ প্রাণশক্তির পরিচয়—কিন্তু বুদ্ধদেব যে চান তাকে ছন্দোবন্ধনের 'মাধুর্যে'র সঙ্গে মেলাতে, ছন্দোমাধুর্যের সেই ধারণা কি কোথাও সংঘর্ষ তৈরি করছে না বাক্‌স্পন্দের বিকাশে ?[৩]

গদ্যের বাক্যবন্ধ নয়, আধুনিক ছন্দের অন্বিষ্ট ছিল সমর্থ বাক্‌স্পন্দের ব্যবহার। সংগত বাক্যবন্ধ থেকেই সেই স্পন্দ রচিত হয় একথা সত্যি, তাহলেও স্পন্দকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব মূল্যে। সেই স্পন্দের সঞ্চার আনেন নানা কবি নানা ভঙ্গিতে। কখনো-বা ছন্দ-দেহ অটুট রেখে তারই মধ্যে বিপরীত বলয়ে আসে গদ্যের লড়াই, কখনো ছন্দকে তার পুরোনো অভ্যাস থেকে ঈষৎ খুলে দেওয়া যায় আপাত-বিশৃঙ্খল গদ্যসমাজের দিকে, আর কখনো হয়তো অধৈর্য প্রত্যাখ্যানে সরা-সরি গদ্যধরনেই নেমে আসা। এই তিন সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টি হতে পেরেছিল বুদ্ধদেব বসুর সন্ধান ?

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় তিনি সহজে প্রস্তুত নন। কবিতার প্রাথমিক বিদ্রোহে অমিল মুক্তবন্ধ লিখেছিলেন তিনি 'পরিশেষ'-'পুনশ্চ'রও কয়েক বছর আগে, বিষ্ণু দে-র মতোই, কিন্তু ছন্দ-সুষমার গাণিতিক অভ্যাস বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে মান্য করতেই দেখি। বাঙলা ছন্দের পর্ব যে প্রায় নিষ্ঠুর রকমে নিয়মিত, এমন-কী অক্ষরবৃত্তের প্রথম আট মাত্রায় ২-৩-৩ বা ৩-২-৩ পরম্পরাও যে একেবারে অচল, সুধীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও একথা মেনে চলেন অনেককাল। 'কিন্তু এই দুর্গ আজো টিঁকে আছে, না-ব'লে, অনবরত', 'অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর', 'ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত

৩ এ-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত বুদ্ধদেবের মন্তব্যগুলি পাওয়া যাবে 'দময়ন্তী'র ঘোষণাপত্রে।

জাগরণের সবকটি কম্পমান পাতা', 'নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান' : এসব মুক্ত প্রয়োগ দেখা দিল কেবল 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে, কিন্তু তখন তিনি আর এ-পথে একা নন, অনেকের একজন মাত্র। পরবর্তী সময়ের বাঁকিয়ে-ধরা এই ভঙ্গি তাঁর প্রথম পঁচিশ বছরের রচনায় কতই দুর্লভ! এমন নয় যে অক্ষরবৃত্তে অনুরূপ চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই গদ্যপদ্যের বিরোধ মিটে যায় অথবা তাকেই বলা চলে পরম সিদ্ধি। আসলে গদ্য বাক্‌বন্ধ ছন্দের ভিতরে যে-ধরনের অবিরল বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে, এ হলো তারই এক ছোটো ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু এই বিপর্যাস এক সময়ে বুদ্ধদেবকে এতটাই অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল যে 'স্ফুলিঙ্গ'র 'অপরাজিতা ফুটিল' বা 'যেন পেয়েছে লিপিকা' লাইন-দুটিকেও তিনি ভাবছিলেন তিন মাত্রার ব্যতিক্রম, একটু ফাটল-ধরানো এই অক্ষরবৃত্তকে নাম দিচ্ছিলেন মিশ্র-ছন্দ।[৪] আবার এই সংকোচের জন্যই ত্রিশ বছর আগে বিষ্ণু দে-র 'জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র জানি সে যে সাধারণই মেয়ে' অথবা 'সংস্কৃত কবিতার নাগরীনাগর' ব্যবহারে তাঁর মন আপত্তি করে উঠেছিল, উচ্চারণভঙ্গিতে শব্দ যে কখনো কখনো টান খেয়ে যায় তা মানতে যেন পুরো প্রস্তুত ছিলেন না তখন।[৫] সাম্প্রতিক কবিদের ছন্দোগত যথেচ্ছাচার বুদ্ধদেব যে প্রসন্ন চোখে দেখবেন না, তা এখন স্বাভাবিক বলেই বোঝা যায়, তাঁর নিজের পুরোনো রচনা সেই ভঙ্গিল ব্যবহারের বিরুদ্ধেই যেন তর্জনী তুলে আছে।

এমন-কী 'পদাতিক' কবির শব্দ-সংশ্লেষ লক্ষ করে যত উত্তেজনা বোধ করেছিলেন 'কালের পুতুল'-এর লেখক (১৯৪০), 'দেখা দিল কলকাতার আরো এক কাল' সত্ত্বেও বলা যায় না যে এর প্রয়োগও তাঁর নিজের রচনায় অবাধ হতে পারল। বরং তার অভাবই কখনো কখনো আমাদের বিচলিত করে। যে-'বিদেশিনী'কে দেখে সুধীন্দ্র-

৪ 'সাহিত্যচর্চা' বইতে 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫ 'কালের পুতুল'-এর অন্তর্গত 'বিষ্ণু দে : চোরাবালি'।

নাথের মনে হয়েছিল, 'আমি যাকে গদ্যগুণ বলি তার বিস্ময়কর প্রাচুর্য ওই কবিতাটিতে', ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত সেই কবিতাই গদ্যটানকে থেকে-থেকে প্রত্যাহত করছে বলেই কিন্তু ধারণা জন্মায়। এইখানে এসে বুঝতে পারি বাক্‌বন্ধ আর বাক্‌স্পন্দের ভিন্নতা। শব্দকটি কী ভাবে সাজানো হবে গদ্যে, এই হলো বাক্‌বন্ধের জিজ্ঞাসা। শব্দকটি কী ভাবে উচ্চারণ করব আমরা, এই হলো বাক্‌স্পন্দের কৌতূহল। 'তবু তার যথেষ্ট হয় নি দেখা' 'এখানে রয়েছে লেখা' বা 'কিংবা কিছু ঐ-ধরনের' বিষয়ে প্রশ্ন তুলব না, কেননা এর ঘোরানো ভঙ্গি তো স্পষ্টতই পদ্য-ভাষার, কিন্তু 'হাতে হাত ঠেকলেও চমকে না-উঠে' 'বাংলোর বারান্দায়' 'করব না খামকা বড়াই' 'তুমি তাঁকে বলবে আমার হয়ে' 'কে যেন উঠল হেসে' : এসবও কি নিঃসংকোচ রাখে আমাদের ? একে কখনোই বলা যাবে না ছন্দপতনের উদাহরণ, বরং পুরোনো প্রথামতো ছন্দ-রক্ষাতেই এদের সতর্কতা, কিন্তু যদি একে বলি স্পন্দপতনের উদাহরণ ? অক্ষরবৃত্তের মাপ ঠিক রাখবার জন্যে চিহ্নিত শব্দাবলিতে অভ্যন্তরীণ রুদ্ধদলগুলি মাত্রা বাড়িয়ে নিচ্ছে, তার ফলে এর উচ্চারণে যতটা দীর্ঘতা এসে যায়, আমাদের স্বাভাবিক বাক্‌রীতিতে তা নেই। ফলে কবিতাপড়ায় দেখা দেয় খানিকটা কৃত্রিমতা, গদ্যের ধ্বনিসঞ্চার কিছু-বা বাধা পায়, চলতি চাল সত্ত্বেও রচনায় আসে যেন এলায়িত ভঙ্গিমা।

একথা ঠিক যে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চান কবি। কখনো সরে যান স্পষ্ট গদ্যের দিকে, যেখানে ছন্দ-রীতি আর কথ্য-রীতি কোনো সংঘর্ষ তৈরি করে না, 'বিদেশিনী'র পরেই লেখা হয় 'মধ্যতিরিশ' 'খণ্ড দৃষ্টি' বা 'ব্যক্ত'র মতো কবিতাবলি ; অন্যদিকে দেখা দিতে শুরু করে আঁটোসাঁটো একটি-দুটি সনেট বা সনেটকল্প ছোটো লেখা। 'প্রত্যহের ভার' বা 'মায়াবী টেবিল'-এর মতো রচনা যেন 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর পূর্বাভাস, দৃঢ় বাঁধুনির আয়োজন। কিন্তু কবির আজীবন স্বরপ্রত্যাশী মন সেই বন্ধনের সময়েও শব্দের সংশ্লেষ-প্রবণতার

চেয়ে বিশ্লেষের ধরনকে কাজে লাগায় বেশি, অনেক স্বচ্ছন্দে। 'বলে, এ তো ফুর্তির ঋতু' 'রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি' বা 'এমন কী কবিতার শব্দে নয়, শব্দের ছন্দে নয়, ছন্দের সম্মোহনে নয়'— 'শীতের প্রার্থনা'র এই ছড়ানো রীতি 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে যেন অতিচারী হয়ে উঠল : 'হৃদয়ের রত্নগুলি—সহনীয় সলজ্জতায়' 'বিচ্ছেদের পারিশ্রমিক' 'ব্যবসার অধ্যবসায়ে' 'লিখে গেল সহস্রাধিক' 'বরং কখনো যারা কাগজের নৌকোয় চ'ড়ে' 'আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন' 'পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত ; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে' 'বিরাট পরিশ্রম শেষ হলে' 'যুদ্ধ কবে খুঁটে খায় : নিমন্ত্রণে অভ্যর্থনার' 'বাক্ অর্থ সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হলে'—এই রকম আরো অনেক। আজকের দিনে অক্ষরবৃত্তের এই বিশ্লেষ কোনোক্রমেই আর অসংগত নয়, কিন্তু সংশ্লেষণের তুলনায় এর প্রতি কবির অপার পক্ষপাত আমাদের আর-একবার জানিয়ে দেয় তাঁর স্রোতস্বান্ মেজাজের কথা, গীতল প্রবাহের প্রতি তাঁর অধীর আগ্রহের কথা।

সেই আগ্রহের চেহারা ধরা ছিল 'কঙ্কাবতী'র কবিতায়। 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'কে দুই মহল বলে মনে হয়েছিল কবির, হয়তো ছন্দের প্রকরণেও এরা দুই মহলের বাসিন্দা। প্রথম বইয়ের 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতাটি দূরাগত আহ্বানের অংশে ছন্দকে একটু দুলিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তা ছাড়া এ-বইয়ের গোটা চেহারাই অক্ষর-বৃত্তের কাঠামোয় গাঁথা, কখনো সনেটে, কখনো-বা খোলা মুক্তবন্ধে। সন্দেহ নেই যে এইটেই আদ্যন্ত তাঁর কবিতাচর্চার প্রধান আশ্রয়, বারবার ঘুরে আসেন এইখানেই, এবং 'কঙ্কাবতী'ও সে-অর্থে সম্পূর্ণ কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবুও, ঐ ছন্দের অনেক ব্যবহার সত্ত্বেও 'কঙ্কাবতী' আমাদের মনে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে মাত্রাবৃত্ত বা একটি-দুটি ছড়ার চালে, আর তা কেবল নাম-কবিতাটির গুণেই নয়। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহী তাপ সরে গিয়ে প্রেম এখানে প্রায় গান হয়ে উঠেছে, খোলা হাওয়ার গান, কবিতা হয়ে উঠছে 'সেরেনাদ'। কবিকে

এখানে মনেই হতে পারে কিছু-বা ছন্দ-বিলাসী, শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিতে মশগুল, শোনা যায় 'চোখে চোখ পড়েই যদি/নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে'র ঠমক, অথবা 'এক সার মেঘ সরু এলোমেলো আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো/গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে/আঁকাবাকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,/আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা'র উতরোল বাজনা।

'নতুন পাতা'কে ছেড়ে দিলে, এর পর বুদ্ধদেবের সব কবিতার বই দোলায়িত হচ্ছে এই দুই ভিন্ন বৃত্তে, বলা যাক 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র বৃত্তে। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'ও তার উদাহরণ। কিন্তু বিপদ এই যে, মাত্রাছন্দে গদ্যের সঙ্গে বিরোধ আরো জোরালো হয়ে ওঠে, এই ছন্দের গহনে মুক্তির পথ আরোই দুর্লভ। বেরিয়ে আসবার একটা ছোটো ধরন হয়তো মেলে মুক্তবন্ধ মাত্রাবৃত্তে, এবং প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তর্কচ্ছলে বুদ্ধদেব বলেওছিলেন, 'মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারও যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে বারবার সম্ভব হবার পথে বাধা রইল কোথায়।'[৬] তবে তত্ত্বগতভাবে বাধা না-থাকা এক কথা আর তার অনায়াস বহুল প্রয়োগ হলো স্বতন্ত্র ব্যাপার। উত্তরকালের ইতিহাস থেকে বুদ্ধদেবকে অন্তত এর চর্চায় ততদূর উৎসাহী বলে মনে করা যায় না, ভাবা যায় না যে এই ছন্দের ভিতরকার সংঘর্ষে তিনি বেশি কোনো মন দিচ্ছেন।

তবে কি এর থেকে মুক্তি তৈরি হতে পারে মিশ্রছন্দে? যেখানে মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তে অথবা স্বরবৃত্ত-অক্ষরবৃত্তে মেশামেশি হয়ে যাবে? ফ্রী ভার্স বা স্প্রাং রীদ্‌ম নিয়ে যখন ভাবছিলেন তিনি এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে বুঝতেও চাইছিলেন এর জটিল রহস্য, সুধীন্দ্রনাথ তখন লিখছেন : 'হঠাৎ মনে হলো যে ছড়ার ছন্দ আর পাঁচ মাত্রার ছন্দ এবং মধ্যে-মধ্যে, খুব সাবধানে, স্বরাঘাতপ্রধান, হলন্তাক্ষরবহুল ছয় মাত্রার ছন্দ মিশিয়ে লিখলে হয়তো-বা স্প্রাং রীদ্‌ম-এর অনুকরণ বাঙালির পক্ষে

---

৬ 'সাহিত্যচর্চা' বইতে 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সম্ভব। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না।' শুভার্থী এই পরামর্শ কতটা তাঁকে সেই কারুকর্মে উত্তেজিত করেছিল? এমন সম্ভাবনার উল্লেখ বুদ্ধদেবের নিজের আলোচনাতেও দেখতে পাই (দ্র 'বাংলা ছন্দ'), এমনকী 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে পাওয়া যায় 'কালো চুল'-এর মতো কবিতা, যেখানে আট-মাত্রা সাত-মাত্রা অনায়াস সফলতায় জায়গা বদল করে :

'কঙ্কাবতী এসে | দাঁড়াল
খুলে দিল কালো চুল, | বিপুল ঢেউ তুলে | লাল সূর্যাস্তের | সন্ধ্যায়।
খুলে গেল পশ্চিমে | সূর্যের জাদুকর | জানালা
রঙের রূপসীরা | বাড়াল মুখ ঐ | শৌখিন প্রাসাদের | জানালায়'

— তাহলেও এই মিশ্রভঙ্গি মূলত অমিয় চক্রবর্তীর পন্থা, বুদ্ধদেব বহুদূর এগোতে চাননি এই ধরন নিয়ে।

অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত, কোনো ছন্দেরই ভিতর দিক থেকে খুলবার আয়োজন বুদ্ধদেবে বিশেষ দেখি না। উপরন্তু তাঁর চরিত্রে আছে সুরের প্রতি অরোধ্য আকর্ষণ। তাঁর কবিতা বানিয়ে তোলে আসক্তি, ছড়িয়ে দেয় 'তীব্র মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয়', আর তারই ফলে আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন কবির স্বরে ভেসে ওঠে 'গান, তাই আজও গান!' এই গান তবে থেকেই যায় শিরায় শিরায়, কিন্তু তবু তো 'মড়কের সংগ্রাম হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার' দেখতে হয় তাঁকে, তবুও তো 'স্বপ্নের তীব্রতা'র সঙ্গে আসে 'দ্বন্দ্বের সংঘাত'। তাঁকে ভাবতেই হয় তবু মুক্তছন্দের কথা, মিশ্রছন্দ এবং স্প্রাং রীদ্‌মের ভাবনা, লক্ষ করতে হয় কীভাবে গদ্যের সঙ্গে অবিরতই সাযুজ্য তৈরি করতে চাইছে আধুনিক পদ্য। 'সাহিত্যচর্চা'র 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি অথবা 'কালের পুতুল'-এর রচনাবলি ছন্দ-বিষয়ে তাঁর এই উন্মুখ কৌতূহলকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তবে কি তিনি নিশ্বাস নেবার জন্যই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসেন গদ্যছন্দের সমতলে, 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র পরে 'নতুন পাতা'য় যেমন? হয়তো তাই।

কিন্তু 'নতুন পাতা' থেকে আজ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর গদ্যছন্দেরও মূল প্রবাহ রবীন্দ্রনাথেরই অনুষঙ্গ ধরিয়ে দেয় বারবার, তার শব্দে বা প্রতিমায় নয়, কিন্তু তার স্পন্দনে। এই কবিদের সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথও দেখতে পাচ্ছিলেন তরুণতরদের গদ্যছন্দে পারস্পরিক ভিন্নতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রে, মনে হয়েছিল তাঁর, 'পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ', সমর সেনের যেন 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য' আর বুদ্ধদেবের কবিতায় 'গদ্যের কণ্ঠে তালমানছেড়া লিরিক'। তালমান-ছেড়া লিরিক? যদি লিরিকই, তবে তালমান ছিঁড়ে কী লাভ হলো? আর তেমন লিরিক তো ছিল রবীন্দ্রনাথেরও গদ্যকবিতায়? তাহলে এখানেও নয়, গদ্যছন্দের এই চেহারাতেও বুদ্ধদেব বসুর এমন কোনো মৌলিক স্পন্দসঞ্চার নয় যা হতে পারে একান্তই তাঁর আপন, তাঁর অথবা বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ।

কিন্তু 'নতুন পাতা'রই মধ্যে যেন দেখা যায় আরো একটি কুঁড়ি, কবির আর-এক রকম প্রকাশের ইঙ্গিত। গদ্যের তালমানছেড়া চেহারাও যে তাঁকে বিব্রত করছে কোথাও, তার আভাস যেন দেখতে পাই এই বইতেই। পদ্যছন্দের যে মৃদঙ্গওয়ালা বোল নেই বলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর গদ্য-কবিতায় স্বস্তি পাচ্ছিলেন, সেই মৃদঙ্গেরই ধ্বনি হঠাৎ বেজে উঠল এর আর-কয়েকটি রচনায়। গদ্যের মধ্যে পদ্যের আমেজ ও মিলের চমক রবীন্দ্রনাথের মতো সুধীন্দ্রনাথেরও আপত্তির বিষয় ছিল, তাহলেও এর প্রয়োগ দেখেছিলাম আমরা অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দে, এবং বুদ্ধদেবের হাতেও উড়ে এল তার কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ :

> **সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার মন্থিত মুহূর্তে**
> **থমকে দাঁড়ায় — যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু মহাশূন্যের যাত্রী —**
> **কোনো উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।**

অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্তর্লীন ঝংকৃত এবং সংহত Vers libre' থেকে

এর চরিত্র অনেকটাই ভিন্ন, এর আছে এক গড়িয়ে-যাওয়া ভারি মন্থর চলন, অমিয় চক্রবর্তীর রচনার মতো ছিপছিপে নয় এর চেহারা।

পশলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ
ধানপাকানো তাপ
টনটনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া,
সোনালিকাঁটা কাঁঠাল, ভরাট আম,
ঝিকমিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।

অমিয় চক্রবর্তীর এসব লাইনের সঙ্গে প্রথমোক্তের সাদৃশ্য কেবল এই যে, দুই লেখাতেই আছে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার। কিন্তু 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ-অংশে এটাই মস্ত কথা নয় যে লাইনশেষে মিল আছে। কয়েক তাল শব্দ গড়িয়ে এসে ঐ যে একটা যুক্তব্যঞ্জনময় ছোটো শব্দে আঘাত পেয়ে থেমে যাচ্ছে, গতি আর যতির এই বিশেষ চাঞ্চল্যটাই এখানে গণ্য করবার, তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে এক অনতিনির্দেশ্য পরিমাপের বোধ। যদি না-ই দেওয়া হতো মিল? তখন উঠে এল আর-এক পরীক্ষা, স্তবকবন্ধের পরিমিতিতে গদ্যেরই এক-একটা শ্লোকসদৃশ ধ্বনিরচনার পরীক্ষা। 'চিল্কায় সকাল'-এ দেখা দিচ্ছে এরই একটা প্রাথমিক ধরন :

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কতো দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে। কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিল

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। ভাখো, ভাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। আর তোমার চোখে
কাঁপছে কতো আকাশ, কতো মৃত্যু, কতো নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

পরম্পরায় এমনি স্তবকবন্ধ, যার শেষ চরণে হঠাৎ ছোটো-হয়ে-আসা এক-একটি উচ্চারণ। ছন্দ আর অছন্দের মধ্যপথ খুঁজতে খুঁজতে

একবার যেন এই শ্লোকবন্ধে এসে দাঁড়ালেন কবি। বুদ্ধদেব একবার লিখেছিলেন যে 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র মধ্যে আছে এক 'যোগসাধনকারী সরু বারান্দা', যার নাম 'পৃথিবীর পথে'। 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ লাইনগুলিতে যেন তেমনি একটি বারান্দা আমরা পেয়ে যাই পূর্ণ বাক্‌স্পন্দ আর বিহ্বল সুরস্পন্দনের মধ্যে। পথ আর ঘরের মাঝখানে এই যে একবার চকিতে বারান্দাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন কবি, একে নিছক আকস্মিকও বলা চলে না, বলতে হয় এষণারই ফলাফল, মনে রাখতে হয় 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে তাঁর এই সতর্ক বিচার : 'বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দুটো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে : একটা রাবীন্দ্রিক রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে, আর-একটাতে মাঝে মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয় :—এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রী ভার্সের উদ্‌ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে'।

'নতুন পাতা'য় এই নতুন ব্যবহার অবশ্য ততখানি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পরেও অনুরূপ পরীক্ষা বুদ্ধদেবে অবিরল দেখা যায় না। কিন্তু দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও এই যে তিনি অল্প সময়ের জন্য ঐখানেই ফিরে যান, ঐ খোলা হাওয়ার বারান্দায়, এবং নতুন-নতুন রচনা-পর্বে আরো-একটু সামর্থ্য সঞ্চার করেন তার মধ্যে—সেটাও একটা বড়ো ইঙ্গিত। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' বইতে 'মধ্যতিরিশ' বা 'খণ্ড দৃষ্টি' কেবলই গদ্যকবিতা, ছন্দের কোনো স্বতন্ত্র মহিমায় এরা স্মরণীয় থাকে না :

শুধু এতেও চলে না,
ঘরে ঘরে পরিচারক চাই।
এই তো আমাদের কালীচরণ।
বুদ্ধি তার যেটুকু দরকার, তার বেশি নেই।
সে বাজার করে, কয়লা ভাঙে, রাঁধেবাড়ে,
দুপুরবেলায় পুরো ঘুমটুকু না-হলেই তার চলে না।

এই প্রাত্যহিক গদ্য অতিক্রম করে যখন পৌঁছই 'কলকাতা' বা

'শীতরাত্রির প্রার্থনা'র মতো কবিতায়, তখন আবার কানে ভেসে আসে পুরোনো সেই শ্লোকগম্ভীর চলন, আরো সংবৃত, আরো প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে :

যখন জন্ম নেয় যৌবন, নৌকোয় পাল ফুলে ওঠে,
আর দূরে, সোনালি কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে, ঝিলিক দেয় মহাদেশ,
তেমনি তুমি ছিলে আমার কাছে—অস্পষ্ট, উজ্জ্বল, অচিন্তনীয়
তুমি, কলকাতা।
অতিথি হয়ে এসেছিলাম তখন, কৌমার্যের লজ্জা নিয়ে,
কিন্তু তুমি, লক্ষ প্রণয়ের নায়িকা, আমার ভীরুতা ভাঙিয়ে,
ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার উপর, যেমন চোখের সামনে হঠাৎ খুলে যায়
অফুরন্ত সমুদ্র।
মনে পড়ে সেইসব মুহূর্ত, যখন ঘুমভাঙা গম্ভীর প্লাটফর্ম
সরে যেত ঘোমটার মতো, আর ঘণ্টা বেজে উঠত আমার বুকে।
—তুমি, আবার তুমি! তোমার তীক্ষ্ণ, প্রবল, পরিশ্রমী ভোর,
ভিস্তির জলে সদ্যস্নাত।

আর, অবশেষে এই রীতি পুঞ্জীভূত স্তবের মতো হয়ে উঠল 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এর সেই সব কবিতায়, যা আসলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র সংলাপ।

এই যে গদ্যের ছন্দে শ্লোকের সুর আর সংহতি, ব্যাপ্তি আর সুমিতি একই সঙ্গে টান-টান করে ধরা, তাঁর একেবারে এই নিজস্ব ছন্দ-রীতি কতটা প্রশ্রয় পাচ্ছিল সংস্কৃত ছন্দ থেকে? দুই বিপরীতের মাঝখানে এই পথ-পেয়ে-যাওয়া কিছু কি বহিরাগত সমর্থনও পাচ্ছিল না? 'মেঘদূত'-এর অনুবাদের কথা এ-প্রসঙ্গে অনিবার্যতই মনে পড়ে। মন্দাক্রান্তার ধ্বনিকল্লোল বিষয়ে সে-বইয়ের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন: 'কবিতা আর মন্ত্র যখন অভিন্ন ছিল, যখন ডাইনিপুরুতের অর্থহীন ও ছন্দোবদ্ধ প্রলাপই ছিল কবিতা—সেই অতিদূর অতীতের স্মৃতি অবচেতনায় হানা দেয় যেন।' এই 'ছন্দের গম্ভীর আন্দোলনে'রই

অনুরূপ এক ঢেউ তুলেছিলেন কবি তাঁর এ-সব কবিতায়। ঠিক কোন সময় থেকে সংস্কৃত এই কবিতাবলির সাহচর্যে তিনি ছিলেন তা আমরা জানি না,[৭] কিন্তু 'শীতের প্রার্থনা'র পরেই তাঁর অভিনিবেশ লক্ষ করি কালিদাস-চর্চায়, আর 'মেঘদূত'-এর ছন্দ-দীক্ষা যেন প্রসারিত হয়ে এল 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পর্যন্ত। অনুবাদের কারণে বোদলেয়র বা রিল্‌কের নিরন্তর সামীপ্য তাঁর উত্তরকালীন অক্ষরবৃত্তকে যেমন অনেকটা ঘনতা দিচ্ছিল বলে অনুমান হয়, মন্দাক্রান্তার ব্যবহারও তেমনি নিতান্ত নিষ্ফল থাকেনি তাঁর অভিজ্ঞতায়। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে গাঁয়ের মেয়েদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা 'আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু' অথবা 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এ 'যে তুমি বিশ্বের প্রথম শিহরণ, আলোর জাগরণ-মন্ত্র' এসব উচ্চারণ মনে রেখেই যে এমন বলছি তা নয়, যদিও সেও একটা কারণ বটে। 'অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ' কিংবা 'উজ্জ্বল হলো মঞ্চ, নটনটী চঞ্চল' এসব রচনাও থেকে-থেকে পশ্চাদ্‌বলয়ে মেঘদূত-এর আভা আনে, আনে তার স্পন্দনগত স্মৃতি। এই ছন্দের প্রয়োগে 'নতুন পাতা' দ্বিধামুক্ত ছিল না, 'শীতের প্রার্থনা' সে-তুলনায় আত্মনির্ভর, কিন্তু এখনো-পর্যন্ত শেষ এই পর্যায়ে তারও পরে এক নতুন মাত্রা লাগল প্রকরণে। কেবল শ্লোকবন্ধ নয়, কবিতার সূচনায় নিয়মিত ছন্দের ধ্বনি পর্যন্ত ভরে উঠছে

৭ 'কবিতা ও আমার জীবন' (১৯৭৩) প্রবন্ধটি ছাপা হবার পর বলা যায় যে তাও আমরা জানি। লিখেছেন বুদ্ধদেব : 'সেবারে বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর···আমার সঙ্গে থাকে রাজশেখর বসু সম্পাদিত মেঘদূত বইখানা, যেহেতু সেটি আকারে ছোটো এবং ওজনে হালকা, ভিড়াক্রান্ত ফিরতি ট্রামে স্বচ্ছন্দে পকেটে চলে যায়, এবং যেহেতু কবিতাটা আমার চমৎকার লাগছে। রাজশেখর বসুর সংস্করণটি বেরোবার পর থেকেই সেটি আমার অন্যতম প্রিয় পুঁথি হয়ে উঠেছিলো, প্রতি বর্ষায় একবার করে পড়তাম।' এই সংস্করণটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪৩ সালে, আর 'সেবার' বিদেশ থেকে ফেরেন বুদ্ধদেব ১৯৫৪-তে।

এখানে, যদিও অল্প পরেই আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে তার জাল। কখনো কখনো এতটাই এসে যায় নিয়ম :

মুক্ত হলো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হলো প্রতীক্ষা ;
শান্তার পতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু :
…উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

এর তৃতীয় পঙ্‌ক্তি থেকে 'যেমন'টুকু সরিয়ে নিলে এর পুরোটাই পাওয়া যায় পরিমিতির মধ্যে, কিন্তু তার পরেই আবার নবীন স্তবকে সরে যাচ্ছে বন্ধন। বাঁধন এবং খোলার মধ্যপথটুকু আরো কতদূর মসৃণ হতে পারে, হয়তো তারও পরীক্ষা এর পর তাঁর রচনায় দেখতে পাব আমরা। ইতিমধ্যে কেবল এ-পর্যন্ত ধরতে পারছি যে, ফ্রী ভার্স বা মুক্তছন্দকে তিনি খুঁজতে চান এই বিপরীত সাধনায়, গদ্যকেই থেকে-থেকে আপাত-পদ্যের দিকে টান দেবার পরীক্ষায়, 'গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার' এই মিশ্র ধরনে। যেমন শিল্পকে জীবনের দিকে নয়, জীবনকেই শিল্পের দিকে আকর্ষণ করতে চান এই কবি, যেমন তাঁকে বলতে হয় :

তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান

তেমনি বাঁধা ছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়। বাংলা কবিতার ছন্দ-অভ্যাসে তিনিও শেষ অবধি মুক্তিই খোঁজেন, তবে ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি।

১৯৬৮

বন্ধুর ছন্দের দুর্গে

'শত শত বর্ণাভাসে এ যেন-বা অর্কেস্ট্রা বিরাট' : [আলেখ্য]

ধনঞ্জয় তার অনুগত নাগরিকদের সাবধান করে দিয়েছিল 'মুক্তধারা' নাটকে : 'জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই-দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।' আমরাও যেন অনেক সময়ে উত্তরকূটীয়-দের মতোই কানঢাকা হয়ে ঘুরে বেড়াই। সব শব্দ শুনতে চাই না আমরা, নির্বাচন করে নিই পছন্দমতো একটা ছোটো জগৎ, আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবাণ এসে লাগে। সব দৃশ্য দেখতে চাই না আমরা, দেখি একটা আত্মরচিত ছোটো জগৎ। অন্ধ হলে যে প্রলয় বন্ধ থাকে না, এ কথা বুঝবার সামর্থ্যও অনেকসময়ে আমরা হারাই।

কিন্তু বিষ্ণু দের কবিতা এই বাণীময় জগৎকে বুঝে নেবার কবিতা, এর সমস্ত ধ্বনি যেন তিনি বর্জনহীনভাবে তুলে নিতে চান তাঁর রচনায়। নিজেকে ঘিরে যে আবরণ আমরা তৈরি করি অনেকসময়ে, তিনি ভেঙে দিতে চান সেই বাধা, তিনি ভেঙে দিতে চান নিজেকে ভোলাবার সহজ-সাধ্য সব আয়োজন। তাঁর কবিতা তাই সরল বা কোমল চালে চলে না, ধ্বনিতে এবং বাণীতে তাঁকে ঘিরে তুলতে হয় এক কঠিন দুর্গ। রচনার বিষয় এবং বিন্যাসে তিনি তাই ব্যবহার করতে চান জটিল আবহ : ধ্বনিপুঞ্জে জটিল, বিচিত্র অভিপ্রায়ে জটিল, বিরোধী বৃত্তির নিরন্তর সংঘর্ষে জটিল। বিষ্ণু দের কবিতায় ছন্দ-ব্যবহারকে বিচার করতে হবে এই দিক থেকে। বুঝে নিতে হবে যে এই জটিল চূড়াই তাঁর ছন্দ-প্রবাহের উৎস।

ছন্দ যে কবিতার প্রসাধনমাত্র নয়, সে যে কবির জীবনযাপনের এক বিশেষ প্রকাশ—এ কথা বিষ্ণু দে ভুলতে পারেন না কখনো।

তিনি জানেন যে কবিতার এক অপরিবর্তনীয় শরীরই হলো ছন্দ। সেই কারণে তিনি ঈষৎ ধিক্কার দেন ডক্টর জিভাগোর সেই কাব্যতত্ত্বকে, যে-তত্ত্বের জের হিসেবে মনে হতে পারে যে ছন্দও যেন আপতিক, বহিরঙ্গ-মাত্র। জিভাগো এক-ছন্দে কবিতা লিখে পরে 'আমূল সেই ছন্দ পালটায়, গদ্যে যেমন পালটানো যায় শব্দ'। বিষ্ণু দে তাই ঠাট্টা করে বলেন, 'যেন ছন্দ কবিতায় শুধু জামাকাপড়, কবিতার শরীর নয়, এ-জামা ছেড়ে ও-জামা পরলেও চলে!' না, তা চলে না, কারণ ছন্দেই কবিতার শরীর। অথবা, আরো একটু গাঢ়ভাবে যেমন বলেছিলেন মারিয়ান মুর, ছন্দ-স্পন্দই হলো কবির ব্যক্তিত্ব।

এটা সহজ কথা যে আধুনিক কবির এই ব্যক্তিত্ব রচিত হচ্ছে আধুনিক যুগেরই পটভূমিকায়। তাই, যুগের এই চরিত্রকে বহন করবার জন্য কবিতার ভাষা আর স্পন্দ কেবলই সাযুজ্য তৈরি করতে চায় আমাদের দৈনন্দিন বাক্‌রীতির সঙ্গে। তাই, আজ আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আধুনিক ছন্দের প্রাণ হলো এর বাক্‌স্পন্দে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে কাকে বলি বাক্‌স্পন্দ। দৈনন্দিন বাক্‌রীতির কথা উল্লেখ করেছি আমরা। কিন্তু কথা বা কথার উচ্চারণে কোনো অতিনির্দিষ্ট 'রীতি' আছে কি, ধরা যাক, এই মুহূর্তের বাংলা দেশে? এ-পাড়ার ও-পাড়ার চালচুলোহীন অবক্ষয়ের চিহ্নে ভরে যাচ্ছে আমাদের ভাষা, আমাদের উচ্চারণ। আবার এরও আছে নানা ধাঁচ, এরও মধ্যে নেই কোনো সর্বব্যাপী সামঞ্জস্য। এই-যে নানা ধরনের কথা পথেঘাটে আমরা হামেশাই শুনতে পাচ্ছি, উপরস্তরের সেই বাক্‌প্রবাহকেই কি বলব আজকের দিনের বাক্‌স্পন্দ? এই লঘু ধরনের নানা ভাষারীতিকে আয়ত্ত করতে গিয়েই কি আমাদের কথাসাহিত্য অনেকসময়ে নিতান্ত সাংবাদিকতার জালে জড়িয়ে পড়ছে না? কলকাতার বিভিন্ন অলিগলির ভাষা আর তার স্পন্দ অবিকল তুলে নিলেই কি বাক্‌স্পন্দের প্রতি কবির দায় ফুরোয়? বেতারে-দৈনিকে প্রতিদিন ভাষা এবং তার যে বিকৃত পরিবেশন, সেইটেকেই বলা যায় না কোনো দেশের অন্তর্লীন বাক্‌রীতি।

তা যদি হতো, তাহলে বাক্‌স্পন্দের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত এলিয়টকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলতে হতো না 'বি. বি. সি. ইংলিশ।' বস্তুত, প্রত্যেক মুহূর্তেই ভাষায় একটা ইতরীকরণের কাজ চলতে থাকে দেশ জুড়ে। কবির কাজ হলো সেই ভাসমান স্তর ভেদ করে খুঁজে দেখা, কোথায় দেশীয় বাক্‌-রীতির মৌলিক তেজ। সেইখান থেকেই কবি তুলে নেবেন তাঁর বাক্‌-স্পন্দ। তাই এও একটা হাতে-পেয়ে-যাওয়া ফল মাত্র নয়, এ হলো দুরূহ চেষ্টায় আবিষ্কার করে নেওয়া এক সামগ্রী। কোনো সাক্ষাৎকারে তাই বলতে হয়েছিল এলিয়টকে, রেডিয়ো-টেলিভিশনের প্রচারমাধ্যম যত ব্যাপক হবে, যতই বেশি প্রতাপশালী হবে বি. বি. সি, সি. বি. এস. বা এন্‌. বি. সি'র মতো যান্ত্রিকতা, ভাষা থেকে তার সত্যিকারের স্পন্দকে চিনে নেওয়া ততই কঠিন হয়ে উঠবে দিনে দিনে।

এই চিনে নেবার আগ্রহে কবিকে সরল পথ ছেড়ে দিতে হয়। এই আগ্রহে কোনো কবির মনে হতে পাবে যে টানা গদ্যে নয়, বাক্‌স্পন্দকে যুঝে নিতে চাই ছন্দকাঠামোর মধ্যেই। হয়তো তাঁর মনে হতে পারে যে গদ্যে ধরা থাকে কেবল উপরস্তরের চেহারা ; মনে হতে পারে যে গদ্যে নেমে এলে যেন কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল, যেন তার মধ্যে আর পাওয়া যাবে না ভাষার অন্তর্গত উপলবন্ধুর গতি, আধুনিক সময়ের যোগ্য জটিল গতি, পাওয়া যাবে না সেই বাক্যস্রোত, যেখানে

শব্দ চলে জোযারভাঁটায়
থাড়াই উৎরাই। পদক্ষেপে পদক্ষেপে দক্ষিণে ও বামে
অস্থির ও একাধারে ভাস্কর্যগম্ভীর...

অস্থির ও একাধারে ভাস্কর্যগম্ভীর : এই হলো বিষ্ণু দে'র ছন্দের পরিচয়। তাই গদ্যছন্দকে—তার লালিত্যময় প্রবাহ বা নিতান্ত শুকনো চেহারাকে—বিষ্ণু দে ভাবতে পারেননি নতুন যুগের ছন্দ। ছন্দের থেকে পুরোপুরি মুক্তি নেওয়াটাই তাঁর প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠে নি। হয়তো-বা এলিয়টের মতো বলতে পারেন তিনিও : 'যে-কবি ভালো কাজ চান তাঁর কাছে কোনো ছন্দই মুক্ত হতে পারে না।' আর

ঠিক সেই কারণে, সমর সেনের মতো কবির বিচার করতে বসেও এই ধরনের মন্তব্য করেন বিষ্ণু দে : 'তবু যে গদ্যছন্দসত্ত্বেও ঝড়ের নিঃশব্দ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা।' হয়তো-বা এই কারণেই তাঁর অসংগতভাবে মনে হয় যে সমর সেনের 'মৃত্যু, পোস্ট-গ্রাজুয়েটেও ছন্দ ঢিলে হয়ে গেছে এক-আধবার' কিংবা 'কয়েকটি দিন' কবিতার শেষ লাইন বিষয়ে বলেন : 'কিন্তু আমার গলায় স্বভাবতই এর শেষ লাইনে চমক লাগে এবং পড়তে ইচ্ছা করে স্তব্ধ মহানদী।' এই ইচ্ছেটা আমাদের আশ্চর্য করে দেয় অবশ্য। কেননা, কেবল সমর সেনের মুক্তছন্দেই নয়, বিষ্ণু দে নিজেও কি তাঁর পরিণত অক্ষরবৃত্তে লিখতে পারতেন না 'বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী?' 'স্তব্ধ মহানদী' লিখে কি সামলে নিতে হতো তাঁকেও?

আসলে, এসব হলো গদ্যছন্দের প্রতি তাঁর বিরূপতারই কয়েকটি বহির্লক্ষণ। তিনি লক্ষ করেন যে গদ্যছন্দের বাঁধুনিতেই আছে এক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা তাঁকে খুশি করতে পারে না। বরং তিনি খোঁজেন সেই বন্ধন, যেখানে 'যথারীতি পদ্যে, এক-এক শ্লোকের বা যমকের বাঁধনে ছন্দ দানা বাঁধে'।

বন্ধন? মুক্তি নয়, তাহলে বন্ধনের স্থৈর্যই তাঁর ছন্দে শেষ কথা? তাও ঠিক বলা যায় না। স্থৈর্য তিনি চান না, তিনি চান এই বন্ধনের মধ্যেই তৈরি হোক একটা সচল টানাপোড়েন, একটা টেন্‌শন। তিনি চান বাইরের পৃথিবীর বস্তুগত বা ভাবগত জটিলতা তাঁর কবিতায় বাঁধা পড়ুক এই ধ্বনিগত টেন্‌শনে। এ বন্ধন মাত্র এটুকু নয় যাকে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন'। এ তার চেয়ে বেশি কিছু। এ বন্ধন মনে রাখে যে 'পদ্যবন্ধ ও বাক্যবিস্তারের আততি সৎ পদ্যের হাতের পায়ের উভয়ত বলিষ্ঠতায় একটি অপরিহার্য গুণ।' পদ্যবন্ধের মধ্যেই তাহলে তিনি আনতে চান ব্যক্যবিস্তার। যে-কথা তিনি লিখেছিলেন মধুসূদনের ছন্দ-বিচার প্রসঙ্গে, তাঁর নিজের ছন্দ বিষয়ে সেটাই যেন যোগ্য ভূমিকা হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে লিখেছেন :

> মাইকেলের পরে একটা ঝোঁক দেখা যায় গোটা লয়পর্বের সামগ্রিকতা ছেড়ে একটি লাইনসর্বস্বতার দিকে এবং তার ফলে একটা সিংসং বা কাব্যি-কাব্য অভিন্নস্বরতার দিকে, ভাস্কর্য ছেড়ে যেন রেখার সরলতায়। তাই বাঙলা পদ্যে ও আবৃত্তিযান্ত্রিক পদ্যপাঠের রীতিতে সচরাচর স্ট্রফির দৃঢবন্ধনীর সেই দার্ঘায়িত সৌন্দর্য থাকে না, যা ইংরেজি কাব্যে আমাদের মুগ্ধ করে এবং যে পদ্যবন্ধ ও বাক্যবিস্তারের আততি সৎ পদ্যের হাতের পায়ের উভয়ত বলিষ্ঠতায় একটি অপরিহার্য গুণ।

বিভিন্ন ধ্বনিবন্ধের পারস্পরিক সংঘর্ষে কীভাবে তৈরি হয়ে ওঠে ওই 'আততি', চল্‌তি জীবনের কথার ছাঁচ থেকে কীভাবে তিনি তুলে নেন এর অন্তর্গত স্বরের উত্থানপতন, বিষ্ণু দের ছন্দে সেইটেই প্রধান বিবেচ্য।

২

সম্ভবত এই কারণেই, এই ধ্বনিবিচার তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা পায় বলেই, বাংলা ছন্দের প্রচলিত আলোচনাবিধি তাঁর কাছে অগ্রাহ্য লাগে। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো বিষ্ণু দেও অনেকসময়ে নেমে আসেন ছন্দের বিচারে; মধুসূদন অথবা পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে, সমর সেন অথবা এমন-কী নিজের কবিতা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তাঁকে তুলতে হয় ছন্দের কথা; কিন্তু কখনোই তিনি ব্যবহার করতে চান না আমাদের ধরে-নেওয়া ছন্দ-পরিভাষা অথবা আমাদের চল্‌তি আলোচনার ধরন।

এটা অবশ্য ঠিক যে আজ পঞ্চাশ বছরের চেষ্টাতেও আমাদের ছন্দ-পরিভাষা একটা সর্বমান্য রূপ পায়নি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শুরু হয়েছিল ছন্দ-বিতর্কের সমারোহ, সেই থেকে চেষ্টা চলছে কীভাবে আমাদের ছন্দ-বিচারকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়। এই বিতর্কে আমরা লক্ষ করেছি কবি আর ছান্দসিকদের বিবাদ, অথবা ছান্দসিকদের নিজেদের মধ্যেই বিবাদ। পরিভাষার কোনো

স্থিরতা ছিল না বলে এসব বিবাদ কখনো-বা হয়ে উঠেছিল নিষ্ফল তর্কবিস্তার, একই বিষয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিন্ন কথা বলার অস্পষ্টতা। রবীন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল, দিলীপকুমার, অমূল্যধন বা প্রবোধচন্দ্র, এঁরা সকলে যে একই ভাষায় কথা বলেন তা নয়। কিন্তু সামঞ্জস্য ছিল তাঁদের অন্বেষণে। মোহিতলাল ছাড়া এঁদের মধ্যে আর সকলেই প্রধানত দেখতে চেয়েছেন ছন্দের কাঠামোটিকে, মন দিয়েছেন এর শ্রেণীগুলির লক্ষণ বিচারে।

এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে যে-পরিভাষা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে আজ, সেই নামগুলিই ছন্দের আলোচনায় আমরা সচরাচর দেখতে পাই। অক্ষরবৃত্ত (যাকে ভুল করে কেউ হয়তো বলেন পয়ার), মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত : এই হলো প্রচলিত সেই নামাবলি। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন অনেক বিচার-বিশ্লেষণের স্তর পেরিয়ে আজ যেসব নাম ব্যবহার করেন তা অবশ্য একটু ভিন্ন। তাঁর দেওয়া সবশেষ নাম হলো মিশ্রকলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত আর দলবৃত্ত। বিশেষজ্ঞেরা হয়তো ক্রমে একদিন এ-নামই ব্যবহার করবেন ; কিন্তু অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলিই এখনো পর্যন্ত সাধারণ্যে প্রচলিত। তাই আরো কিছুদিন বাংলা ছন্দ-বিচারের আসর জুড়ে থাকবে এই নামগুলি, এ-রকম অনুমান করা অসংগত নয়।

আধুনিক কালে যখন বুদ্ধদেব বসু বা জীবনানন্দ দাশ ছন্দ বিষয়ে মন্তব্য করেন, তখন তাঁরা এইসব প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করতে বড়ো একটা দ্বিধা করেন না। প্রবোধচন্দ্রের মতামত বা পরিভাষাকে যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ভাবেন বুদ্ধদেব, তা অবশ্য নয়। কিন্তু তবু মনে হয় যে এঁদের মধ্যে কোনো সংলাপ সম্ভব। অন্তত বোঝা যায় যে ছন্দের কোনো খুঁটিনাটি নিয়ে এঁরা পরস্পর তর্ক করতে পারেন। কিন্তু মনে হয় না যে তেমন কোনো সংলাপ বা বিতর্ক সম্ভব বিষ্ণু দের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের অথবা বিষ্ণু দের সঙ্গে বুদ্ধদেবের। কেননা বিষ্ণু দে ঐ জাতীয় শ্রেণীবিশ্লেষণ নিয়ে বড়ো একটা ভাবিত নন, ছন্দ বিষয়ে তাঁর

মন একেবারে ভিন্ন সমস্যায় চলে যেতে চায়।

তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ছন্দ-বিচারের কোনো স্বতন্ত্র আদর্শ তাঁর মনে তিনি লালন করেন। সেটা অসংগত নয়। তাঁর কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবলে সেটা বরং প্রত্যাশিত। মোহিতলাল যেমন একটু বেশিরকম ভাবছিলেন বাংলা ছন্দে প্রস্বরপ্রভাবের কথা, বিষ্ণু দেও হয়তো তেমনি এর ধ্বনিগত উচ্চাবচতার দিকেই দৃষ্টি দিতে চান বেশি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, এ-আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি কি তাঁর নিজস্ব কোনো ছন্দশাস্ত্র তুলে আনতে পারেন আমাদের সামনে? যেসব আলোচনা তিনি করেন, তার মধ্যে কি নির্দিষ্ট থাকে তাঁর নিজস্ব কোনো পরিভাষা? প্রচলিত পরিভাষা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় অনেকসময়ে কি তিনি ঝাপসা করে দেন না সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তি? দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যাক মধুসূদনের কাব্যবিচার থেকে খানিকটা অংশ :

> তাই বাঙলা ছন্দের স্বভাব-সম্বন্ধে তাঁকে আর কারো কাছে পাঠ নিতে হয় নি, তিনি নিজের সহজাত বোধেই আবিষ্কার করেন যে, আমাদের সপ্তপদী বা সপ্তমাত্রিক পদ্যই আমাদের হিরোইক মেসার, কারণ আমাদের ভাষা স্বরাঘাত ও স্বরমানের দিক থেকে অগ্রদানী, পতিত। প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভালো, আমরা হয়তো এই সপ্তস্বরা বা পয়ারের আঁটসাঁট কটিবন্ধে আড়ষ্ট বোধ করেছি এবং ইংরেজি আয়ম্বসের পঞ্চপদী পূর্ণতার সন্ধানে দুটি পদ বা স্বরাক্ষর যোগ করেছি···

পাঠকমাত্রকেই বিহ্বল করতে পারে এই লাইনকটি। এর বক্তব্য বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না তুলেও আমরা নিশ্চয় জানতে চাইব, লেখক এখানে কি স্বর অক্ষর পদ বা মাত্রা শব্দগুলির একেবারে খামখেয়ালী প্রয়োগ করছেন না? এই উক্তির হিসেবমতো দাঁড়ায় যেন পয়ার=সপ্তস্বরা=সপ্তমাত্রিক=সপ্তপদী। তাহলে স্বর মাত্রা আর পদ বলতে কি বিষ্ণু দে একই কথা বোঝেন? আবার পদকে বলা হলো স্বরাক্ষর। তার মানে কি এই যে স্বর আর স্বরাক্ষর একই কথা? যদি তাই হয়, তবে আর 'অক্ষর'কে 'স্বরে'র সঙ্গে যুক্ত করে লাভ কী হলো? এর কোনো একটা

গূঢ় উত্তর কবির মনে প্রচ্ছন্ন থাকতেও পারে, কিন্তু সে উত্তর এখানে কোনো স্পষ্ট অবয়ব পাচ্ছে না এও সত্যি।

আমার বলবার কথাটা এই যে, সংগত কারণে বিষ্ণু দে প্রচলিত ছন্দ-পরিভাষা বর্জন করে এগোতে চান, কিন্তু সেই বর্জনের সপক্ষে কোনো নিজস্ব পরিভাষা তিনি তৈরি করে নেন না। ফলে প্রচলিত ব্যবহারে অভ্যস্ত পাঠক তাঁর ছন্দ-বিষয়ক মন্তব্যে পৌঁছে যোগ্য কোনো নির্দেশ পায় না, আভাসে ইঙ্গিতে খানিকটা অনুমান করে নেয় মাত্র।

এসব মন্তব্যে অন্য লাভ অবশ্য আছে। এর থেকেই আমরা ক্রমে এগিয়ে যেতে পারি বিষ্ণু দে'র নিজের ছন্দ-ব্যবহারের দিকে, বুঝতে পারি কোথায় তিনি অর্জন করতে চান তাঁর আপন ধরন। বাংলা চোদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত যে আঠারো মাত্রার লাইনে পৌঁছল, বিষ্ণু দে'র ধারণামতো ইংরেজি আয়াম্বিক পেন্টামিটারের আদর্শসন্ধানই তার কারণ কি না, এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। এমন হতেও পারে যে যুগেরই বিস্তার চাইছিল এই পঙ্‌ক্তিবন্ধনেরও বিস্তার। আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তিই বাড়িয়ে নিতে চাইছিল এর শ্বাসপর্বকে। ভুললে চলবে না যে রঙ্গলালের রচনাতেই একবার চকিতে দেখা দিয়েছিল এই আঠারো মাত্রার মাপ। আর এর ফল হিসেবে যে 'বাক্‌বাহুল্য বা মেদাক্ত দৌর্বল্য' তৈরি হয়েছে শ্বাসপর্বের শরীরে, যোগ্য কবিদের ক্ষেত্রে সে-আশঙ্কাও বড়ো-একটা সত্যি বলে মনে হয় না। কিন্তু এসব তর্ক ছেড়ে দিলে, বোঝা যায়, বিষ্ণু দে তাঁর নিজের ছন্দে বাক্‌বিস্তার চান, চান না বাক্‌বাহুল্য; চান লাইনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে একটা গোটা লয়পর্বের সামগ্রিকতা (এখানেও আমাদের আর-একবার মনে পড়ে মারিয়ান মুরের কথা, যিনি পঙ্‌ক্তি-একক ছেড়ে দিয়ে চলতে চেয়েছিলেন স্তবকের এককে) 'সিংসং বা কাব্যি-কাব্য অভিন্নস্বরতা' বা 'রেখার সরলতা' ছেড়ে দিয়ে তিনি চান ছন্দের ভাস্কর্য, দীর্ঘায়িত সৌন্দর্য, 'পদ্যবন্ধ ও বাক্যবিস্তারের আততি'। 'সংবাদ মূলত কাব্য'র এ লাইন যেন নিজেকেই তিনি শোনান :

পয়ার যমকে নয়, তুমি বাঁধো শতাব্দীর পঞ্চাঙ্ক নাট্যের
দীর্ঘলয়ে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ বন্ধুর ছন্দের দুর্গে সহিষ্ণু জীবন।

ফলে, মধুসূদন যে 'আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি/শর্বরী' কথাটিকে বদল করেছিলেন, লিখেছিলেন, 'আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি/শর্বরী' তা ছান্দসিকদের সশ্রদ্ধ প্রশ্রয় পেলেও বিষ্ণু দে এতে খুশি হতে পারেন না। মধুসূদন মনে করেছিলেন, 'the double syllable ন্ত mars the strength of লা'। আর বিষ্ণু দে ভাবছেন, 'তারাকুন্তলার তরঙ্গায়িত ধ্বনি এবং চিত্রময়তায় পর্বটি আরো সাংগীতিক ঐশ্বর্য লাভ করত'।

সিংসং বা অভিন্নস্বরে নয়, বিষ্ণু দে'র সাংগীতিক ঐশ্বর্যের ধারণা নির্ভর করছে এই তরঙ্গায়িত ধ্বনির সামর্থ্যে, বিভিন্ন স্বরসংঘাতের এই প্রবল পৌরুষে।

৩

এই পৌরুষ বা সামর্থ্য অথবা স্বরের উত্থানপতন কীভাবে কবি নিজের রচনায় সঞ্চারিত করেন, সেইটেই এখন আমরা দেখতে চাই। যাকে আমরা বলে থাকি সুরেলা বা মিষ্টি লাইন, সেইটেকেই তাহলে ভাঙতে চান এই কবি। সহজ সুরের দিক থেকে, গীতল প্রবাহের দিক থেকে মধুসূদনের ঐ লাইনে 'তারাকুন্তলা'র চেয়ে 'সুচারুতারা'ই শোভন ছিল বেশি; সহজ সুরকে ভেঙে দিতে চাইলেও মধুসূদন যে তাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে পারেননি, তা বোঝা যায় এই দৃষ্টান্ত থেকে। কিন্তু এই পরিবর্তনে সমস্যা কি শুধু এইটুকু ছিল যে 'ন্ত' ধ্বনি 'লা' ধ্বনিকে নষ্ট করে দিচ্ছে? 'আইলা কুন্তলাতারা' লেখা সম্ভব হলে সেই সম্ভাবনা কি ছেড়ে দিতেন মধুসূদন? অর্থাৎ, ওখানে কি আরো একটি সমস্যা উঁকি দিচ্ছে না—পর্বের মধ্যে মাত্রা সমাবেশের রীতিগত সমস্যা?

ছান্দসিক বলবেন, অক্ষরবৃত্তের এই চেহারায় আটমাত্রার অংশটুকুর মধ্যে তিন-দুই-তিন সমাবেশ অসিদ্ধ, শ্রুতিকঠোর। অনেকদিন পর্যন্ত

কবিরা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন এই অসংগত সমাবেশ; কিন্তু আজ আমরা জানি যে আধুনিক কবি আর গ্রাহ্য করেন না এই বিশেষ দায়। তিনি শ্রুতিকঠোর করবার জন্যেই অনেক সময়ে সরিয়ে নেন তাঁর সুরবাহী মাত্রাসামঞ্জস্য, কবিতায় আনতে চান সহজ সুরের পরিবর্তে তির্যক সুর।

এই পথেই বিষ্ণু দে এগিয়ে যান আরো খানিকটা। মুক্তবন্ধ বা সমপদী অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রাপারম্পর্যের যে ধারণা, 'সন্দীপের চর' পর্যন্ত বিষ্ণু দে'ও তা প্রায় লঙ্ঘন করেন না। ৬, ৮, ৮+৬ বা ৮+১০ বা ৮+৮+৬ মাত্রার হিসেবেই সাজানো থাকে তাঁর লাইন। কিন্তু তার পরেই ভাঙতে থাকে এই সন্নিবেশ, 'অন্বিষ্ট' কবিতার অক্ষরবৃত্তে চলে আসে এসব লাইন: 'তাই তো দেখেছি নিভৃত বনের মৌনে' অথবা 'তাই তেপান্তরে পাহাড়ের আড়ে'। এটা তাৎপর্যময় ব্যাপার যে 'অন্বিষ্ট' বই থেকেই শুরু হলো সচেতন এই ভঙ্গ ব্যবহার। তাৎপর্যময় এইজন্যে যে এ-বই থেকেই কবি সরাসরি দেখতে চাইছেন গতির ও স্থিতির মিলন, প্রকৃতি ও জীবনের সামঞ্জস্য, 'সেই লাল সেই সাতরঙার সিম্ফনি'; এখানেই 'অনিবার্য যতির স্তব্ধতা/শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে/কবিতার ছন্দের মতন' জেগে উঠছে স্পষ্ট ভাষায়। আর, এর পর আমরা পৌঁছই 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ, যেখানে শুনি: 'বিরাট উদার উর্বর প্রাচীন রঙিন উজ্জ্বল আসমুদ্র হিমাচল'। বিশেষণ ব্যবহারের ঔদার্যে এ হয়তো মনে করিয়ে দেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর-একটি লাইন, জীবনানন্দের: 'অন্ধকারের বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়'। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে এই তিন মাত্রার পদক্ষেপ দেখে আমরা সতর্ক হয়ে উঠি, বুঝতে পারি যে দুই বা চার মাত্রায় চলার মাঝখানে হঠাৎ এই বিষম পদক্ষেপে কবি থমকে দেন তাঁর পাঠকের অনায়াস পাঠ। থেকে-থেকে এই ধরনের প্রয়োগে ভরে উঠতে থাকে বিষ্ণু দে'র পরবর্তী রচনাবলি:

'অথবা হাজার জন্তর দন্তর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল'
'সৌন্দর্য যাদের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব আপ্লুত'

'মুখের নিটোল, কটির ভাঙন, বক্ষের পাহাড়'
'রাবীন্দ্রিক কবিত্বের মতো যৌবন প্রবল সফেন মন্দ্রিত'
'স্বসংগঠিত মৌলিক আনন্দে একান্তই মানবিক'
'বিরোধে সংগীতে মাত্র সংগত সার্থক উত্তীর্ণ সুষমা'
'শুধু বিবর্ণ গুমোট অপ্রাকৃতিক গরম'
'দেহ, জানি, অতি মহাশয়/ব্যক্তি, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য'
'দুর্বোধ একালে অমানুষিক বিচ্ছেদ এই একাত্মের মানুষে মানুষে'

এসব লাইনে কোথাও থাকে তিনের মাপে চলা অথবা মাত্রাসমাবেশের চলিত রীতি ভেঙে দেওয়া, আবার সেই সঙ্গে এখানে নিহিত থাকে তাঁর যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহারের নিজস্ব কৌশল। এমন করে তিনি বলেন 'ব্যক্তি, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য' 'যৌবন প্রবল সফেন মন্দ্রিত' অথবা 'সংগত সার্থক উত্তীর্ণ সুষমা' যে শব্দগুলি কখনোই একের চাপে অন্যটি হারিয়ে যেতে পারে না, গড়িয়ে পড়তে পারে না একে অন্যের গায়ে, তৈরি হয় একটা রূঢ় প্রোজেইক ধরন। আর এই ধরনের ফলে কবিতা থেকে সরে আসে আবেগবহুল ব্যক্তিগত সুরের চাপ, বস্তুর স্পষ্টতায় নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দাঁড়িয়ে যায় তাঁর কথা। আর এইটেই যে তাঁর অভিপ্রায়ের অন্তর্গত সেকথা বোঝা যায় তাঁর নিজের কবিতা পড়ার ধরন মনে রাখলে। যে 'আবৃত্তিযান্ত্রিক পদ্যপাঠে'র রীতিকে ধিক্‌কার দেন বিষ্ণু দে, তাঁর নিজের পড়া সেই আবৃত্তি-বশীভূত হয় না কখনো— এমনি করেই শব্দগুলিকে ছেড়ে-ছেড়ে উচ্চারণ করেন তিনি, তাঁর ছন্দ যা চায়।

৪

কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাসে একেও বলব না বিষ্ণু দে'র সবচেয়ে বড়ো মৌলিকতা। অক্ষরবৃত্তে মাত্রাসমাবেশকে এইভাবে ভেঙে দেওয়া

১ প্রথম লাইনটি 'সেই অন্ধকার চাই' বই থেকে; পরবর্তী তিনটি আছে 'সংবাদ মূলত কাব্য' বইতে; 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' থেকে শেষকটি।

অথবা ধ্বনিকঠোরতার প্রয়োগে ভেঙে দেওয়া কবিতার লালিত্য,—এ কাজ যে বিষ্ণু দে একাই করেন তা নয়। এমন কিছু কি তিনি করেন না তাঁর ছন্দসৃষ্টিতে, যাকে বলা যায় পূর্বাপরহীন, নিতান্তই তাঁর একলার?

সে কথা বিচার করবার আগে একবার ভেবে দেখা যাক তাঁর মাত্রাবৃত্তের রহস্য। অক্ষরবৃত্তের মতো মাত্রাবৃত্তকেও তিনি ব্যবহার করেন সমান আনন্দে, বরং এতটাই বলা যায় যে এ ছন্দকে প্রায় কখনোই ছাড়তে পারেন না তিনি। 'চোরাবালি' বা 'ক্রেসিডা' বা 'ওফেলিয়া' থেকেই দেখতে পাই তাঁর এই আগ্রহের প্রমাণ। হয়তো এইটুকু বলা যায় যে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' থেকে অল্পে অল্পে ছ'মাত্রার ঝোঁকটা সরে আসছে সাত মাত্রার দিকে।

কিন্তু এই মাত্রাবৃত্ত—ছয় সাত বা পাঁচ যে মাত্রারই হোক না কেন —বিষ্ণু দে'র হাতে নতুন হয়ে ওঠে কোন্ গুণে? কোন্ লক্ষণ দেখে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে রাবীন্দ্রিক মাত্রাছন্দকে নিজের সুরে বাজাতে পেরেছেন বিষ্ণু দে? রবীন্দ্রনাথ থেকে কোথায় তিনি ভিন্ন হয়ে যান?

এর একটা সহজ উত্তর হতে পারে। এই দুই কবির শব্দব্যবহারের প্রকৃতি এক নয়, অতএব শব্দসংঘাতজনিত ধ্বনিতরঙ্গও এক মাপের নয়। কিন্তু স্বাদের স্বাতন্ত্র্য কি কেবল এই কারণেই? না কি এই কারণে যে মাত্রাবৃত্তের অপরিবর্তনীয় মাত্রাসংখ্যাতেও ইচ্ছেমতো স্বাধীনতা নেন বিষ্ণু দে? 'কোয়ার্টেট যেন কোনো অতন্দ্রিত/অপরাজেয় গ্রোস ফুগের গান' এর প্রথম অংশে ৭+৫ ভাগ কোনো ছান্দসিকের কানে মনে হতে পারে অমান্য। তেমনি চার মাত্রা বা আট মাত্রার ছন্দে তিনি বসিয়ে দেন 'তাকাস পাহাড়ের ভিড়ে' বা 'বক্ষ কাঁপে তোর তরে'র মতো লাইন। কিন্তু এসব উদাহরণ তো পাই আমরা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' বইতে, অর্থাৎ এ হলো তাঁর উত্তরকালীন অভ্যাস।

মনে হয়, এর চেয়ে ভিন্ন কোনো উত্তর আছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু আগেই বিষ্ণু দে বাংলা কবিতায় নিয়ে আসেন প্রবহমান এবং মুক্তবন্ধ মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগ, যেমন পাই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বা 'চোরাবালি'র

অনেক লেখাতেই। আবার, যখন আমরা শুনি :

> পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
> কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
> কামনার টানে সংহত গ্রেসিয়ার।
> হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো
> হে দূর্ দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার।

তখন বুদ্ধদেব বসুর মতো আমাদেরও মনে হয় যে এই শেষ লাইনে যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, কীভাবে সম্ভব হলো এই শব্দের সঞ্চার। ত্রিপর্বিক লাইনগুলো ধরে চলতে চলতে হঠাৎ এই চতুষ্পর্বিক শেষ পঙ্‌ক্তিতে এসে দোলা খেয়ে যায় মন, আর ছ'মাত্রার এই কবিতা ওই লাইনে এসে যেন টগবগ করে চলতে থাকে প্রায় তিনের তালে : হে দূর্/দেশের/বিশ্ব/বিজয়ী/দীপ্ত/ঘোড়সো/য়ার।

এই 'চোরাবালি' কবিতাটি ঘন স্তবকবন্ধে রচিত। কিন্তু সে স্তবকের নেই কোনো নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তি-পরিমাপ, অথবা পঙ্‌ক্তিতে নেই নির্দিষ্ট পর্বপরিমাপ। তাই উদ্ধৃত অংশের অল্প পরেই শুনতে পাব আমরা :

> জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
> মেরুচূড়া জনহীন
> হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
> লোকনিন্দার দিন।

একই বৃত্তের ছন্দে স্পন্দনগত ভিন্নতা আনা যায় তার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা বা পর্বসংখ্যার বৈচিত্র্য এনে। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় এই ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দের হয়তো ব্যবহার করেন একই ছন্দের পাত্রে, কিন্তু একই কবিতায় এই বিভিন্ন স্পন্দসঞ্চারের চেষ্টা তাঁর সহজাত অভ্যাস নয়। এইখানেই বিষ্ণু দে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেন তাঁর মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে, আর এরই প্রবল প্রচুর প্রয়োগ দেখা দিল 'ওফেলিয়া' বা 'ক্রেসিডা'র মতো কবিতায়। এই দুই কবিতায় স্পন্দবদল হতে লাগল 'চোরাবালি'র

তুলনায় আরো বেশি মুহুর্মুহু, আরো অল্প ব্যবধানে :

উদ্ধত প্রেমে উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়াকে হানো।

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া আসা।

অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হলো মর্ত্যলোকেই।
ধূমকেতু এই বিরাট দাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি।

মুক্তবন্ধের সহজ ছড়িয়ে-পড়া প্রগল্‌ভ রীতি এর নয়। এর ছোটো ছোটো প্রায়আত্মপূর্ণ স্তবকগুলিতে আছে একটা আঁটোসাঁটো গড়ন। অথচ এরই মধ্যে আবার আছে সেই গড়ন থেকে মুক্তি নেওয়া, কেননা একটা গতির ধরন প্রতিষ্ঠা পেতে না পেতেই চলে আসে আর-এক গতির উলটো ধাক্কা। আর এসব কবিতায় স্পন্দনগতির এই পরিবর্তন কেবল যে পঙ্‌ক্তি বা পর্ব -মাপের ভিন্নতার উপরই নির্ভর করছে তা নয়, কখনো কখনো মাত্রাসংখ্যা অথবা এমন-কী বৃত্তই যাচ্ছে পালটে। 'ওফেলিয়া' কবিতা শুরু হয় অক্ষরবৃত্তে, পাঁচ লাইন পরে দ্বিতীয় স্তবকেই পৌঁছই ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্তে, তারপর দেখি কখনো-বা চলে আসে পাঁচ মাত্রার ছন্দ। তাহলে স্পন্দ-বদলের ইচ্ছেয় বিষ্ণু দে কবিতার ভিতরে দ্রুত ছন্দ-বদল করে নেন, এক ছন্দ-রীতিতে চলতে গিয়েই শুরু হয় বিপরীত ছন্দে চলা, আর এই বৈপরীত্যের সংঘর্ষে তৈরি হয় একটা সমবেত ধ্বনির জটিলতা : 'আঘাতে বিরামে তালের গতিতে আর লয়ের স্থিতিতে, ঠেকা আর বোলে।'

৫

এতক্ষণে তাহলে আমরা পৌছতে পেরেছি সেই কেন্দ্রে, যেখান থেকে বিষ্ণু দে ধরেন তাঁর ছন্দের প্রকৃত শক্তি। স্তবকে স্তবকে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন স্পন্দ সঞ্চার, কবিতার ভিন্ন ভিন্ন চাল বা মুভমেণ্টে ভিন্ন ধরনের ছন্দ বা স্তবকের আয়োজন—এই হলো সেই কেন্দ্র। অভিন্ন সুরের একটানা গীতল প্রবাহ নয়, তার পরিবর্তে বিষ্ণু দে চান যে এইভাবে তৈরি হোক এক বিচিত্র স্বরের সংগতি। হারমনি বা স্বরসংগতি, পশ্চিমি সংগীতের এই ঐশ্বর্যের দিকে তাঁর কবিতাকে এগিয়ে নিতে চান তিনি, ক্রমশ তাঁর কবিতা পেয়ে যায় একটা সিম্ফনির গড়ন। তাই এটা একেবারেই আকস্মিক নয় বা বাইরের বাহার নয় যে থেকে-থেকেই তিনি পশ্চিমি সংগীতের পরিভাষা ব্যবহার করেন তাঁর কবিতায়, তাঁর রচনায় সহজেই চলে আসে সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা, কোয়ার্টেট বা ফুগের উল্লেখ। এই দিক থেকেই তাঁর ছন্দের মধ্যে ধরা পড়ে যায় 'ডী কুনশট্‌ ডের ফুগে' অথবা 'অপরাজেয় গ্রোস ফুগের গান।' বাখ বীটোফেন বা মোৎসার্টের উল্লেখ এদিক থেকেই তাঁর কবিতার অন্তর্বিষয় হয়ে ওঠে।

'পূর্বলেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি এক হিসেবে বিষ্ণু দে'র কবিতা-জীবনের বড়ো একটি বাঁক, আর এই কবিতাটিকে কবি যুক্ত করে নেন বীটোফেনের মহিমান্বিত নবম সিম্ফনির সঙ্গে। সিম্ফনিতে ব্যবহৃত গানের ভূমিকা থেকে নেওয়া প্রথম লাইনটি 'জন্মাষ্টমী'র শিরোভূষণ: 'বন্ধু, আর এ দুঃখের গান নয়।' সংঘাতময় পতনবন্ধুর জীবনের পটভূমিকে মনে রেখেও তার থেকে উদ্‌গত হয়ে ওঠা আশাময় উল্লাস। এই বাণীর সঙ্গে যেমন যুক্ত হয়ে গেল এ কবিতা, তেমনি এ যেন বিষ্ণু দে'র কবিতার বিন্যাসকেও মিলিয়ে নিল কাউণ্টারপয়েণ্টে সাজানো সাংগীতিক গতির সঙ্গে, তৈরি হলো তাঁর কবিতায় বড়ো মাপের ভিন্ন ভিন্ন মুভমেণ্ট। এ আর 'ওফেলিয়া' বা 'ক্রেসিডা'র ধরনের দ্রুত স্পন্দবদল নয়, এখানে এক-একটা ভাব বা ভাবনার বিকাশের সময় দিতে হলো অনেকটা, মননরীতির বা অনুভূতিপ্রকাশের যোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটে

নেওয়া হলো ছন্দের চাল। আর, অন্যান্য অনেক সূত্রের মতো, এদিক থেকেও আমরা বুঝতে পারি এলিয়টের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের ধরন।

যেসব কবিতায় এইভাবে বড়ো মাপের কয়েকটি মুভমেণ্টে একটি সিম্ফনির গড়ন এসেছে, সেখানে যে সবসময়েই ছন্দের বৃত্তগত বদল ঘটেছে তা নিশ্চয় নয়। যেমন ধরা যাক 'কঙ্কালীতলা' 'চৈতে বৈশাখে' 'জল দাও' বা 'টাইরেসিয়াস'-এর মতো কবিতা। এসব ক্ষেত্রে গোটা কবিতাই অক্ষরবৃত্তে লেখা বটে, কিন্তু কবি তাঁর ছন্দবদল করে নেন সন্নিবেশের কৌশলে। এদের শুরু হয়তো মুক্তবন্ধ রূপে, তারপরেই কখনো এবা পৌঁছে যায় ঘনবিন্যস্ত পরিমিত স্তবকবন্ধে, আবার কবি খুলে নেন তাকে মুক্তবন্ধের দিকে। এইভাবেই 'জল দাও' কবিতার প্রথম মুভমেণ্টে 'একরাশ শাদা বেলফুল' দেখার পরেই শুরু হলো সাত লাইনে সাজানো চারটি স্তবক, আমাদের প্রায় মনে পড়ে যায় 'ড্রাই স্যালোয়েজেস'-এর সেস্টিনার কথা। মনে পড়ে যায় আরো এই কারণে যে এখানেও সেই সেস্টিনারই ধরনে মিত্রাক্ষর প্রয়োগ করেন কবি, প্রতি স্তবকের প্রথম লাইনে আসে এক মিত্রাক্ষর, প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় লাইনে আর-একটি এবং এই রকম চলতে থাকে শেষ পর্যন্ত।

'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' বইতে 'অসম্পূর্ণের কবিতা'টি মনে রেখেও বলা চলে যে 'শীলভদ্র পঞ্চমুখ' (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩/সেই অন্ধকার চাই) রচনাই হলো এই সিম্ফনিক গড়নের শেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা। আর এখানেও, কবি আমাদের কিছুতেই ভুলতে দেন না এলিয়টের স্মৃতি। বিষয়ে ও বিন্যাসে এও নিয়ে আসে 'ফোর কোয়ার্টেট্স'-এর আবহ, বিশেষত 'ড্রাই স্যালোয়েজেস'-এর। এলিয়টের ঐ কবিতা থেকে সরাসরি অনুবাদ করেই কিছু অংশ বিষ্ণু দে ব্যবহার করেন উদ্ধৃতিচিহ্নে। আবার তার বাইরেও নিজের ভঙ্গিতে তিনি আত্তীকৃত করে নেন এইসব উল্লেখ: 'নদীর সমস্যা বহু' 'যন্ত্রের পূজারী লোকে' 'আমাদের ভিতরে ও চতুর্দিকে নানারূপে মহানদী' 'প্রাচীন আদিম জন্তু' 'গতিহীন ভবিষ্যৎহীন নদীর তরল স্রোত' এবং শেষ পর্যন্ত 'এলিয়টও দেখেছেন মিসিসিপি

মিস্মুরিতে বোঝাবোঝা মড়া/নিগ্রো শব, গোরু মোষ, মোরগ মুর্গির ঝাঁকা, দূষিত আপেল আর আপেলে দংশন'।

'ওফেলিয়া' বা 'ক্রেসিডা'র মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পঞ্চাঙ্ক নাটকের বীজ। সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত পরিণত হয়ে উঠল বিষ্ণু দে'র এই ধ্বনি-সংঘাতময় বিচিত্রগতির কবিতাবলির মধ্যে, পূর্ণ হলো নাটক। এসব কবিতায় এই নাট্যসম্পূর্ণতা আছে বলেই এর অন্তর্গত ছন্দবদলকে রবীন্দ্রনাথের 'ইসটেশন' (নবজাতক) বা 'আশা' (পূরবী) কবিতার মতো আকস্মিক খেলা বা সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কির গান' আর 'দূরের পাল্লা'র মতো ক্ষণিক অনুভূতির ব্যাপার বলা যায় না। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হতে পারে সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি, যার নাম থেকেই অনেকটা সামীপ্য পাওয়া যায় এর অভিপ্রায়ের। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের একটিমাত্র ওই রচনা থেকে উঁকি দেয় এর প্রসাধনকলার দিকটাও। কবিতার এই বহিঃপ্রসাধনের চর্চাকে বিষ্ণু দে কাজে লাগান একটু ভিন্নভাবে। মিলের বিনুনিতে গাঁথা ট্রিয়োলেট বালাদ বা ভিলানেল: বিচিত্র এই ছন্দ-রূপগুলির মধ্যে আসলে তিনি সংহত করে নিতে চান নিজেকে, এখানেও কাজ করে একটা বাঁধুনিরই অভিপ্রায়।

এইভাবে আমরা দেখি, একটানা সুর থেকে আলগা করে সরিয়ে নিয়ে সংঘাতশীল এক বিচিত্র সুরসংগতির দিকে আমাদের নিয়ে যেতে চান বিষ্ণু দে, এই হলো তাঁর ছন্দ-চর্চার সবচেয়ে বড়ো দিক। এই চর্চারই ইঙ্গিত তাঁর 'ক্রেসিডা' থেকে 'অসম্পূর্ণের কবিতা' পর্যন্ত। এই চর্চা সবচেয়ে বেড়ে যায় তাঁর মধ্যবর্তী পর্যায়ে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ আছে এ-রকম দশটি কবিতা আর 'আলেখ্য' বইতে পাই ন'টি। 'শীলভদ্র পঞ্চমুখ'-এর পর যেন খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসছে এই রীতি, অন্তত বড়ো মাপের কোনো সিম্ফনিক কবিতা ওরই সঙ্গে শেষ হয়েছে। এই আট বছরে কেন আর ও-রকম লিখছেন না কবি? সে কি কেবল এইজন্যে যে 'যা ছিল বলার কবে হয়ে গেছে বলা সে'? সে কি এইজন্যে যে আজ বয়স্ক কবির 'বাস্তবের মুঠি ঢিলা হয়ে গেছে',

যেমন তিনি লিখেছিলেন 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' প্রবন্ধে? কিন্তু বলার তো তাঁর বিরাম নেই, আর তাঁর শেষ লেখাও তো বাস্তবের তাপ ধরে রাখে কিছু। তাহলে সেই সিম্ফনির অভাব কি অন্য কারণে? সে কি এইজন্যে যে এই আট বছরে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল রাজনীতি আত্মবিরোধে ছিন্ন-ছিন্ন হয়ে গেছে, আত্মক্ষয় এবং সর্বনাশের দৈনন্দিন ছবির মধ্যে কবি আজ কোনো ব্যাপক বাস্তবিক সামঞ্জস্য আর ধরতে পারছেন না? একথা ঠিক যে আশার স্বর এখনো তাঁর কবিতার শক্তি, আশা না বলে তাকে বলা উচিত ভিশ্‌ন্‌। কিন্তু আজ যেন এই ভিশ্‌ন্‌ সমগ্র বৈপরীত্যের সমবায়ের উপর নির্ভর করে তৈরি হতে পারছে না আর, যেন অনেকটাই তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে শুভেচ্ছার উপর। হয়তো আমরা প্রতীক্ষা করে থাকতে পারি ছন্দে উৎফুল্লবিচলিত তাঁর পরবর্তী এক দীর্ঘ কবিতার জন্য, আর-একটি সমবেত উৎসারের জন্য, যেখানে এই শুভেচ্ছা কোনো বিস্তীর্ণ ও বাস্তব ভিত্তি পাবে।

ইতিমধ্যে বুঝে নেওয়া চাই যে কথ্যস্পন্দই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কবিতায়, কিন্তু সহজ অভ্যাসে নয়, তিনি চেয়েছিলেন সেই স্পন্দের ভিতরকার শক্তি নিষ্কাশন করে নিতে। সেইজন্যেই তিনি পেতে চান পরুষে-কোমলে মেলানো এক ছন্দ-রূপের চর্চা। তাই এই কথ্য জগতেরই সঙ্গে ভিতর দিক থেকে তিনি মিলিয়ে ধরতে চান তাঁর লোকসংগীতের প্রতি আগ্রহ বা রবীন্দ্রসংগীতে আসক্তি, 'তোমার বাউলে মিলাই বন্ধু কাস্তের মেঠো স্বর': এই আগ্রহেই তাঁর কবিতায় দৈনন্দিন জগতের মধ্যে ভেসে আসে সুচিত্রা মিত্র বা রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠস্বর। বিপরীতের সামঞ্জস্যময় সেই বিরাট ছন্দ বিষ্ণু দে'র কাছে হয়ে দাঁড়ায় জীবনেরই এক সুরক্ষিত দুর্গ:

জীবনে জীবন গড়ি শত শত থাল
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা।

১৯৭১

নিঃশব্দতার ছন্দ

‘যদি ঝড় নেমে আসে
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ ক’রে…
তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।’

(ঝড়)

অবক্ষয়, বাঁকা কথা আর গদ্যছন্দের কবি হিসেবে যাঁর সাধারণ পরিচয়, সেই সমর সেনের কবিতাসংগ্রহটি শুরু হয়েছে ‘ছন্দ’ আর ‘সুর’ এই দুটি শব্দ দিয়ে। বইয়ের প্রথম কবিতার নাম ‘নিঃশব্দতার ছন্দ’ আর দ্বিতীয়টি হলো ‘একটি রাত্রের সুর’। দুটি ভিন্ন কবিতা, কিন্তু এক হিসেবে দুটিকে একত্র করে নিলে যেন তৈরি হয়ে ওঠে পূর্ণতর একটি লেখা। প্রথমটির বিরহবিধুর নায়ক প্রশ্ন করেছিল ‘স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও’, প্রশ্ন করেছিল কেন নায়িকা এত ভাষাহীন, নিঃশব্দ। আর দ্বিতীয়টিতে সে নিজেই বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ধূসর সন্ধ্যায় তখন সে শুনে নিতে চেয়েছিল একটি সুর, যেখানে ফুলের গন্ধের সঙ্গে বাইরের বাতাসে মিশে থাকে কিসের হাহাকার আর করুণ আর্তনাদ। গন্ধের তুলনায় এই হাহাকারকেই অবশ্য আমরা বেশি মনে রাখি সমর সেনের কবিতায়, কিন্তু তবু লক্ষ করতে হবে কীভাবে প্রথম কবিতার আকুতিভরা প্রশ্ন তৃতীয় স্তবকে একটি উত্তরও পেয়ে যায়, অন্ধকার মাটিতে প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে কীভাবে একটা সামঞ্জস্য হয় এই বিরহ-স্তব্ধতার, কীভাবে এই স্তব্ধতাকে মনে হয় ছন্দোময়। সবসময়েই যে এ অনুভবের দৃঢ়তা থাকে তা নিশ্চয় নয়, তবু হাহাকারের মধ্যে কান পেতে কবি মাঝেমাঝে শুনতে পান সেই ছন্দ, তাকে ধরবার জন্য নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসেন বাইরে, যে-বাইরের প্রকৃতিতে আছে এক দ্বন্দ্ব-জটিলতা। কঠিনতার সঙ্গে স্নিগ্ধতার, মুখরতার সঙ্গে অস্ফুটতার, অন্ধ-

কারের সঙ্গে বিদ্যুতের সেই দ্বন্দ্ব নিয়ে তৈরি হয় 'একটি রাত্রের সুর'।

যে-দুটি কবিতার কথা বলা হলো এখানে, তা ছিল প্রেমেরই ব্যাকুল কবিতা। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে এও ঠিক যে প্রথাগত কোনো প্রেমের কবিতা এ নয়, এখানে প্রেম একেবারে পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে এক সময়বোধের সঙ্গে। নিরাশাখিন্ন নায়ক এখানে যার মধ্য দিয়ে ছন্দ খুঁজছে সে কেবল নারীই নয়, সে হলো ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক ব্যাপ্ত সময়। এলিয়ট তাঁর 'লেডি অব সায়লেন্সেস'কে যেমন একইসঙ্গে শরীরী আর অশরীরী মূর্তিতে দেখেছিলেন 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' কবিতায়, মানবিক কামনা থেকে স্বর্গীয় বাসনা পর্যন্ত একই সঙ্গে যেমন ধরতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে, সমর সেনের এই 'তুমি'ও অনেকটা তা-ই। ভিন্নতা কেবল এই যে, এলিয়টের সেই কবিতায় নিঃশব্দের নারী তাঁকে উর্ধ্বচারী হবার পথ দেখায়, এগিয়ে দেয় কোনো আধ্যাত্মিক শব্দের মুক্তিতে ; আর সমর সেনের 'তুমি' হতে চায় ইতিহাসের দিশারি। তাই, যে-কবিতায় ধূসর জীবন থেকে রাত্রির স্তব্ধতা পার হয়ে আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতার দিকে কবি আহ্বান করছেন কোনো 'তুমি'কে, আর সে তবু চুপ করে আছে স্তিমিত হাসিতে আর অশান্ত বিষণ্নতায়, সমর সেনের কাছে সেই কবিতারই নাম হতে পারে 'ইতিহাস'।

কিন্তু এই ইতিহাস কি বিষণ্নতাতেই শেষ হয়ে যায় সমর সেনের কবিতায়? হিংস্র পশুর মতো অন্ধকারে অবক্ষয়েরই একটা ব্যাপক ছবি অবশ্য দেখাতে চেয়েছিলেন কবি। 'মাই হাউস ইজ এ ডিকেয়্‌ড্‌ হাউস'—লিখেছিলেন এলিয়ট। তেমনই এক ক্ষয়ের পরিবেশে, 'মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস' দেখে, পশ্চিমি গণতন্ত্র নামে 'দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা'র বৃত্তে সমর সেনকে কেবলই বলতে হচ্ছিল বিষণ্ন-সূর্যাস্ত শবের-সান্নিধ্য তান্ত্রিক-স্তব্ধতা শরীরসর্বস্ব-আলিঙ্গন বা ঘড়ির-কাঁটার-মন্থর-মুহূর্তের কথা। তাই এলিয়টের ডেজার্ট বা ডেড ল্যাণ্ড বা ক্যাকটাস ল্যাণ্ড তাঁর কবিতায় ছায়া রেখে যাচ্ছিল, তাঁর কবিতাও ভরে উঠছিল বন্ধ্যাজমি মরামাঠ মরুভূমি বা ফণীমনসার ছবিতে, 'বণিক সভ্যতার শূন্য

মরুভূমি' থেকে 'নরম শরীরে'র মরুভূমি পর্যন্ত তার বিস্তার, আকাশ থেকে সময় পর্যন্ত সবকিছুই সেখানে হয়ে উঠছিল মরুময়। এলিয়টের প্রুফ্রক বা পোর্ট্রেট বা প্রোলোগ-এর মতো ধোঁয়াধুলোকুয়াশা আর হলুদ রঙে ভরে থাকছিল সমর সেনেরও কবিতা। 'স্বর্গ হতে বিদায়' লেখাটিতে 'হে শহর, হে ধূসর শহর' ধরনের ধুয়োগুলিও যে আমাদের এলিয়টকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল তা কেবল 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর 'O City, city'-র মতো আবর্তিত উচ্চারণগুলির জন্যেই নয়, তার সঙ্গে লগ্ন অন্য অনুষঙ্গ-গুলির জন্যেও বটে। ধূসর কুয়াশায় ঢাকা অবাস্তব শহরে এলিয়ট শুনিয়ে-ছিলেন বণিকের এই আহ্বান: To luncheon at the Cannon Street Hotel/Followed by a weekend at the metropole', আর ধূসর শহরে সমর সেনের নায়কও যান 'মোটরে আর বারে/আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে'; 'A crowd flowed over London Bridge' সমর সেনের কবিতায় শুনিয়ে যায় 'কালিঘাট ব্রিজের উপরে' কোনো পদধ্বনি, কিংবা 'পিচের পথে/অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ'।

এইসব, এবং এর তুল্য আরো অনেক অনেক নজির থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেন বুদ্ধদেব বসুকে সমর সেন লিখেছিলেন তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে: 'আমাদের বখাটে generation-এর শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট'। কতটাই এ শ্রেষ্ঠতার বোধ, সেই চিহ্ন সবসময়েই ছড়ানো থাকত তাঁর অল্পবয়সের ভাবনাচিন্তায়, চিঠিপত্রে। বি. বি. সি.তে এলিয়টের কোনো বক্তৃতা বা কবিতাপড়ার খবর জানলে আগ্রহভরে তিনি অগ্রিম সেটা জানিয়ে দেন বুদ্ধদেবকে বা বিষ্ণু দে-কে, পরে কখনো মন্তব্য করেন তাঁর আবৃত্তিধরন নিয়ে, লক্ষ করেন তাঁর 'গলার mature melancholy' কিংবা তুলনা করে বোঝেন যে বিষ্ণু দে-র চেয়ে বরং 'সুধীনবাবুর আবৃত্তির সঙ্গে এলিয়ট-সাহেবের আরো মিল'। এলিয়টের কবিতা এতটাই মজ্জার মধ্যে কাজ করে যে প্রগতিপন্থী কোনো কবিতাসংকলন পড়ে বুদ্ধদেবকে নিজের হতাশা জানাবার মুহূর্তেও তাঁর কলমে উঠে আসে 'দ্য রক'-এর কোরাস থেকে পাওয়া এইসব শব্দবন্ধ: Waste and void

waste and void !

তাই, প্রথমে কারো মনে হতে পারে : সেদিনকার অনেক সমালোচকের এই অভিযোগ সত্যি ছিল যে সমর সেনের মতো কবিরা মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন এক মৌসুমি ফুলের চর্চা করছেন ছাদের টবে, কেননা তাঁরা কবিতা লিখছেন নিছক বিদেশের ছাঁচ নিয়ে, আর তাঁরা আশ্রয় করছেন 'ব্রিটিশ Decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা' এলিয়টকে। অভিযোগ ছিল এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল এক অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দিয়ে বাংলা কবিতার সর্বনাশ করছেন তাঁরা। নিষ্ক্রিয়তা আর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস যে মার্ক্সবাদের পরিপন্থী, সেকথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন প্রগতিশীল সমালোচকেরা। কিন্তু, এলিয়টের দিকে প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও, অবক্ষয়ের ওই প্রশ্রয়ই কি ছিল সমর সেনের কবিতার মূল লক্ষণ, এমনকী তাঁর প্রথম পর্বেও ? এ বিচারের জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হয় তাঁর কবিতার একটু ভিতর দিকে।

নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদী সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত যে সমর সেনের আক্রমণেরই লক্ষ্য, কবিতাগুলির প্রথমপাঠেই সেকথা বোঝা যায়। তবু সেদিন ব্যাখ্যা করে লিখতে হচ্ছিল তাঁকে : 'গ্রহণ-এর নামকবিতায় যে টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক....'। খুব স্পষ্ট ভাষাতেই এই কবি সেই মুমূর্ষু জীবনধাঁচকে প্রত্যাখ্যান করতে চান বা 'ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম'-এর বর্ণনাকে ঠাট্টা করে নেন এইসব লাইনে : 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তাছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার / দুর্লভ সুযোগ'। তাঁর কবিতার একটা অংশ জুড়ে থাকে সেইসব বুদ্ধিজীবীর কথা, যাদের 'Jupiter first deprives of reason those whom he wishes to destroy', যারা ধৃতরাষ্ট্রের মতো ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস শোনে আর জ্ঞানপাপীর মতো বলে 'আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই'। কিন্তু এই ধ্বংসোন্মুখ রূপটির পাশাপাশি তাঁর কবিতা কি প্রথম থেকে একটা নতুন স্বপ্নেরও ছন্দ রেখে যায় না ?

প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতায় আমরা স্বপ্নের সেই ছন্দটাকে খুঁজব কেমন

করে। কবি যে সবসময়ে সেটা প্রত্যক্ষঘোষণার মধ্য দিয়ে করতে চান বা করতে পারেন তা নয়। কবি কথা বলেন তাঁর প্রতিমার বিন্যাসে-প্রতিবিন্যাসে, তাঁর যুক্তি অনেকসময়ে ধরা পড়ে তাঁর সত্তাসমগ্র থেকে উঠে-আসা কোনো আবেগে ; তাঁর আবেগই তখন হয়ে ওঠে তাঁর যুক্তি। সেই বিন্যাসের দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখব যে সমর সেনের একেবারে প্রথম পর্বের কবিতাতেও একধরনের প্রত্যয় আর প্রত্যাশা কাজ করে যায়, আর সেইজন্যেই—কেবল 'একটি রাত্রের সুর' কবিতায় নয়—প্রায় সর্বত্রই তৈরি হয়ে ওঠে সেই কঠিনতার সঙ্গে স্নিগ্ধতার, মুখরতার সঙ্গে অস্ফুটতার, অন্ধকারের সঙ্গে বিদ্যুতের দ্বন্দ্ব। তাঁর কবিতায় হাওয়ার মদির গন্ধে রাত্রির বর্ণহীন আকাশও এনে দেয় লালের ইঙ্গিত, অশান্ত সূর্যাস্তে কবি দেখেন ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল, হাহাকারের মধ্যে জেগে ওঠে ক্ষুধার্ত দীপ্তি, আকাশের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভাস, অলস স্বপ্নের পাশেই বিষাক্ত সাপের মতো বাসনা, হিংস্র পশুর মতো অন্ধকারে রক্তকরবীর মতো আকাশ। বিপরীতের এই সংঘর্ষে, সন্ধ্যার জলস্রোতে কবি যে 'গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ' দেখেছিলেন, 'ধূসরতা'র পাশাপাশি সেই 'উজ্জ্বলতা'ও তাঁর এক প্রিয় এবং বহুব্যবহৃত শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। নিঃশব্দ বা স্তব্ধতা অবিরাম ছড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায়, পাথর নদী আকাশ দিন রাত্রি, সবকিছুরই বিশেষণ হয়ে আসে এই নিঃশব্দ। কিন্তু সেই নিঃশব্দতার বিশেষণ কখনো 'উজ্জ্বল' কখনো 'তিব্বতী' কখনো-বা 'তান্ত্রিক', কেননা ওই স্তব্ধতারই মধ্যে তিনি শুনতে চান কোনো 'ঝড়ের....সঞ্চারণ', কোনো 'নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন', 'দুরন্ত মেঘের মতো' কোনো আবির্ভাব। বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে কোমল সবুজ স্তব্ধতা আসে, সমর সেনের কবিতায় ছড়িয়ে আছে সেই স্তব্ধতা। বিপরীতের সেই সম্ভাবনাতেই এ স্তব্ধতা ছন্দোময়। একদিন হয়তো শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ করে ঝড় নেমে আসবে, ভেঙে যাবে স্তব্ধতা। সেই ঝড়ের কথাটা কবির আবেগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় বলেই তাঁর কবিতা নিছক 'ডেকাডেন্স'-এর বিমর্ষতা থেকে উত্তীর্ণ

হয়ে আসে, সেইটে আছে বলেই স্তব্ধরাত্রের একাকিত্বের মধ্যেও আশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তাঁর কবিতার বিরহী নায়ক : 'মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি/তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ'।

২

কবিতার ভাবনা বা ছবির মধ্যে বিপরীতের ওই-যে সংঘর্ষ, তাকে সংগত রূপ দিয়েছিল সমর সেনের আঁটো গদ্যছন্দ। দিগন্ত থেকে উঠে-আসা একটি বেগ্‌নি রঙের মেঘ দেখে এই কবির যে মনে হয়েছিল 'তার হঠাৎ চঞ্চলতায়/প্রাচীন ভাস্কর্যের অচঞ্চল গভীরতা আঁকা', তাঁর নিজের কবিতার প্রখর আবেগটানও সেইরকমই এক অচঞ্চল ভাস্কর্যের সংহতিতে বাঁধা আছে। বিমলচন্দ্র সিংহ একবার লিখেছিলেন, এসব কবিতায় যেন পাওয়া যায় এপস্টাইন বা এরিক গিলের 'প্রাস্তরিক সৌন্দর্য'। কীভাবে তৈরি হতে পেরেছিল সেই সৌন্দর্য? কবিতা যে 'turning loose of emotion' নয়, এলিয়টের কাছে বাংলা কবিতার এই দীক্ষার দরকার ছিল বলে সমর সেন জানিয়েছেন তাঁর বাবুবৃত্তান্তে। কবিতাচর্চা ছেড়ে দেবার অনেক পর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিরিশের কবিতা বিষয়ে লিখেছিলেন তিনি, বাংলা কাব্যের শ্লথ দেহে তাঁরা চেয়েছিলেন ঋজুতা। সেই ঋজুতার খোঁজে তাঁর কবিতাগুলি প্রায়ই ছোটো ছোটো, শব্দের ঘনতায় তার বাঁধুনি, লাইনগুলি অনতিপ্রলম্বিত, আর এইসব মিলিয়ে এর একটা থমকলাগা কাটাকাটা উচ্চারণ। এইখানে এর ভাস্কর্য, আবার ওরই সঙ্গে এর ধ্বনির মধ্যে অন্তঃশায়ী বিষাদকোমল একটা টানও থেকে যায়। ফলে সমর সেনের গদ্যছন্দ যে নিজস্ব একটা ধ্বনিরূপ তৈরি করে তুলেছিল, অল্প কয়েকটি কবিতা পড়েই রবীন্দ্রনাথ সেকথা বলতে পেরেছিলেন; এই গদ্যছন্দে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্যের প্রকাশ'।

এমন নয় যে রচনার প্রথম মুহূর্ত থেকেই সমর সেন তাঁর এই রূঢ়-লাবণ্যের প্রকাশরীতিটা পেয়ে গিয়েছিলেন। কবিতা লিখতে শুরু করেই

তিনি গদ্যছন্দের আশ্রয় নেননি। 'বন্দীর বন্দনা'-মুগ্ধ প্রায়-আঠারোর এই যুবক যখন কয়েকটি কবিতা নিয়ে পৌঁছেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর কাছে, তখন ছন্দেই লিখতেন তিনি। কিন্তু—এই দুই কবিই তাঁদের স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—বুদ্ধদেবই তাঁকে পরামর্শ দেন 'নিয়মিত ছন্দের চেষ্টা ছেড়ে গদ্যে লিখতে' (সমর সেন), কেননা 'তার ছন্দের হাত টলোমলো' (বুদ্ধদেব)। এ অবশ্য সব অর্থেই নেপথ্যকাহিনী, চর্চাপর্বের সেই টলোমলো লেখা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি কখনো, তবে এ তথ্যটি পরে হয়তো আমাদের কাজে লাগতে পারে।

বুদ্ধদেব পরামর্শ দিয়েছিলেন গদ্যছন্দে লিখতে, এ পর্যন্ত ঠিক। কিন্তু সে-ছন্দ যে কোন্ সুর বাজিয়ে তুলবে, কী হবে তার ধরন, সে-নির্দেশ দেওয়া নিশ্চয় অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। গদ্যছন্দ একটা নির্বিশেষ কথা, তার তো কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই, তাই সে-ছন্দের অনেক ভিন্ন এবং বিশেষ চেহারা তৈরি হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে, এমনকী একই কবি ভিন্ন মেজাজে তাঁর রচনায় আনতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন চাল। 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' 'সাধারণ মেয়ে' আর 'পৃথিবী', তিনটিরই ছন্দ গদ্য, কিন্তু একইরকম অবয়ব নয় রবীন্দ্রনাথের ওই তিন কবিতার। কতটাই প্রভেদ ঘটে যায় হুইটম্যানের লাইনডিঙোনো গদ্যকবিতার দীর্ঘ বাক্যে আর র‍্যাঁবো-র কবিতার টানা গদ্যে কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর অরুণ মিত্রের গদ্যছন্দে! একই পরিবেশের একই উন্মাদ প্রজন্মের কথা বলবার জন্য গিনসবার্গের 'হাউল'-এ দরকার হয় 'I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked'-এর মতো দীর্ঘ লাইন, আর ফার্লিং-গেত্তির দরকার হয় শ্বাসেপ্রশ্বাসে কাটা 'I fly and see America/ is mad mother /is being transformed in fillingstations /is Lucky Louie in two shoes····' ধরনের টুকরো টুকরো অংশ। গদ্যছন্দের কোন্ বিশেষ ধ্বনিরূপ কবি ব্যবহার করবেন, সেটা নির্ভর করে তাঁর নিজের নির্বাচনের ওপর।

তবে, এ নির্বাচন সবসময়ে সচেতন বুদ্ধির কাজ নয়। কবিতাসৃষ্টির মুহূর্তে সমস্ত শরীর থেকে আপনিই উঠে আসছে কোনো স্বর, স্ফূর্ত কোনো ছন্দকে কবি অনুভব করছেন তাঁর রক্তের মধ্যে, ফ্রস্টের মতো এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় অনেক কবিরই ঘটে। নিজের কবিতা নিয়ে বিশেষ কথা বলতে চাইতেন না সমর সেন, কিন্তু তাঁর স্বল্প উচ্চারণের মধ্যেও তিনি বলেছেন কীভাবে বেশি রাতে মোমিনপুর থেকে হেঁটে ফিরতেন বেহালায়, আর পথচল্‌তি 'ট্রামের গতিছন্দে কবিতার অনেক লাইন মনে দানা বাঁধত'। ফলে তিনি অনুমান করেছেন যে ট্রামের গতিছন্দ হয়তো তাঁর গদ্যছন্দের মূলে ছিল। কিন্তু কীরকম সেই ট্রামের ছন্দ? সকলের কাছে তা অবশ্য একইরকম নয়, অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো শুনেছিলেন 'ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল / একটা মন্থর ট্রাম' কিংবা অন্য কোনো সময়ে 'রাত্রের শেষ ট্রাম / ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে' অথবা 'একটা ট্রাম / তার পেছনে পেছনে' তেড়ে গেল। সমর সেন যে ট্রামের ছন্দে একটা গদ্য-আশ্রয় পেয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয় ঝড়ের চেয়ে ভিন্নতর কোনো সুরের জন্য, ঝাঁকুনিহীন তালহারা কোনো টানা সুর। এখানেও চকিতে একবার এলিয়টকে মনে পড়ে, মনে পড়ে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'এর 'Trams and dusty trees / Highbury bore me', মনে পড়ে যে সেই একই ক্লান্তিকে ধরবার জন্য 'ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন' বা 'ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ'র কথা মাঝে মাঝে বলেন সমর সেন।

ক্লান্তি বা মন্থরতাটাই এখানে তবে বড়ো কথা, তাঁর কবিতায় 'ধূসর'-এর মতো আরো দুএকটি বহুব্যবহৃত শব্দ হলো 'মন্থর' বা 'দীর্ঘশ্বাস', আর সেই সূত্রেই তাঁর ছন্দের সঙ্গে ট্রামট্রেনকে মিলিয়ে দেখা যায়। তা নইলে, নিছক ট্রামের টানাধ্বনির কথা ভাবলে, দীর্ঘতর লাইনের স্পন্দনই বরং তাঁর কবিতায় প্রত্যাশিত হতে পারত। টুকরো টুকরো লাইনে গদ্যছন্দকে যেভাবে 'বেতাল' করে দিতে চেয়েছেন সমর সেন, সেই বেতাল ধ্বনি ঠিক ট্রামচলনের অনুষঙ্গ আনে কি না সন্দেহ। তবু, সে-চলন যে কীভাবে তাঁকে ঘিরেও রাখছিল ভিতরে ভিতরে, সেটা আরেকটু স্পষ্ট হয় তাঁর

নিজেরই করা ইংরেজি অনুবাদগুলির দিকে তাকালে, যেখানে 'একটি রাত্রের সুর'-এর মতো চব্বিশটি ছোটো লাইনের কবিতাকে দীর্ঘতর চোদ্দ লাইনে সাজিয়ে দেন কবি, বা 'মহুয়ার দেশ' 'নববর্ষের প্রস্তাব'-এর মতো কবিতাগুলিকে সাজান দৃশ্যতই গদ্যে। এরই প্রসঙ্গে বরং ব্যবহার করা যায় তাঁর 'চার অধ্যায়'-এর লাইন : 'চারদিকে ঘেরে দীর্ঘছন্দে / সুদীর্ঘ অন্ধকার'।

ট্রামের কথা যদি ছেড়ে দিই, মূল কবিতার গদ্যছন্দে এই মন্থরতাকে ধরবার জন্য যে উচ্চারণভঙ্গি তিনি তৈরি করেন, নিছক ছন্দের প্রকরণে তার কি কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল? রবীন্দ্রনাথ যে সহজেই এর স্বরবৈশিষ্ট্য চিনতে পেরেছিলেন, লাইন-সাজানোর পদ্ধতির মধ্যে তার ইশারা ছিল কিছু? 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা থেকে তিনটি গদ্যকবিতার শেষ লাইন-গুলি যদি দেখি :

১. জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা কয়ে উঠল—
আর মেঘের গায়ে গায়ে নেমে এল স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হয়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

২. কেতকীর গন্ধে দুরন্ত
এই অন্ধকার আমাকে কী করে ছোঁবে?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের সুদূর, নিঃসঙ্গ।

৩. একা চাঁদ আকাশে।
দূরের কোন্ বন উঠল চঞ্চল হয়ে।
পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ল,
একটা হরিণ ঘুমভাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।
আমার সময় যে কাটে না, সে নেই।

যে-অর্থে হুইটম্যান আর র‍্যাঁবো-র বা গিনসবার্গ আর ফার্লিংগেত্তি-র

ছন্দোরূপের ভিন্নতার কথা বলা যায়, তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত নেই এ তিনটি অংশে। প্রায় একই বিন্যাসের পাঁচটি লাইনে অংশতিনটি সাজানো। নিছক ছন্দের বিচারে একই রকম এদের চেহারা।

কিন্তু তবু, একইরকম চরিত্র এদের নয়। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এদের একটা স্বর-স্বাতন্ত্র্যও যে বোঝা যায় তাতে সন্দেহ নেই। সে-স্বাতন্ত্র্য তৈরি হতে পারছে কিসে? এদের বাক্যের গড়নে, এদের শব্দের বিশিষ্টতায়। মধ্যবর্তী অংশটির প্রতি লাইনেই আছে এক বা একাধিক যুক্তবর্ণের আঘাত, আছে ক্রিয়াপদের স্বল্প প্রয়োগ। প্রথম বা দ্বিতীয়টির কথার ধরনে যদি লেখা হতো 'পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় আমি শান্ত হয়ে আছি' (যেমন 'একটা হরিণ ঘুমভাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে' কিংবা 'আমার চোখ ঘুমে নরম হয়ে আসবে, নীলিমা') তাহলে, হয়তো আরেকটু ধ্বনিগত সামীপ্য পেত লেখাগুলি। বাক্যেরই সংহতি এখানে ছন্দসংহতির মায়া তৈরি করে দিচ্ছে, আর সেইটেকেই আমরা ভাবছি গদ্যছন্দের বিশিষ্টতা। গদ্যছন্দের তো কোনো নিয়মিত বাঁধা রূপ নেই, তাই শব্দ আর অন্বয় থেকে পাওয়া ধ্বনিতরঙ্গই তার চরিত্র হয়ে ওঠে, সেই ধ্বনির ভিন্নতার সঙ্গেসঙ্গেই ছন্দকেও তাই ভিন্ন বলে মনে হতে থাকে।

উদ্ধৃত অংশ তিনটির প্রথমটি লিখেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, তৃতীয়টি বুদ্ধদেব, আর সমর সেনের লেখা ছিল দ্বিতীয়টি। কেবল এই অংশটিতে নয়, নিষ্ক্রিয় সমাজের মুমূর্ষাকে ধরতে গিয়ে সমর সেনের কবিতায় এই ক্রিয়াহীন খর্ব বাক্যপ্রয়োগের রীতি দেখতে পাব প্রায়ই :

১. কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আরো কত দিন!

২. স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,

আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ,
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার ।

৩. দীর্ঘ, দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো :
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো সুন্দর,
অন্ধকারের মতো ভারি ।

৪. দিনশেষে আজান ,
পড়ন্ত রোদ, পরে আদিম অন্ধকার,
তারপর আবার সূর্য,
প্রাচীন অথচ দীপ্ত,
স্থবির, যুবক যযাতি যেন ,
আলো, রোদ, অন্ধকার
দিনের পর দিন ।

এবং এইরকমই আরো অনেক, যেখানে লাইনের পর লাইন চলছে, একটিও ক্রিয়াপদ নেই, আর ক্রিয়াহীন এই বাক্যসংহতিতে তৈরি হয়ে উঠছে তাঁর গদ্যছন্দের সেই থমকলাগা কাটাকাটা ভঙ্গি, তাঁর স্বাতন্ত্র্য। ‘আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী’র গম্ভীর গমক অথবা ‘রাজার খাজনাবাকির দায়ে বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে’র লতিয়ে-পড়া দৈনন্দিনতা থেকে নিজেকে তা আলাদা করে নেয়। কিন্তু ওরই সঙ্গে, শব্দ বা বাক্যাংশের মুহুর্মুহু পুনরাবর্তনের ফলে ভিতরে-ভিতরে একটা লিরিকলাবণ্যও তৈরি হতে থাকে সমর সেনের কবিতায়। ‘একটি রাত্রের সুর’-এ ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকারের কথা যে ঘুরে ঘুরেই এসেছিল, সেটা তাঁর কবিতার একটা সাধারণ আবেশসঞ্চারী পদ্ধতি, এর মধ্য দিয়েই বাঁধা পড়ে তার দীর্ঘশ্বাস আর আবেগের চাপা মুহূর্তগুলি।

৩

অল্পদিনই কবিতা লিখেছিলেন সমর সেন। কিন্তু সেই অল্প কয়েক বছরের লেখা ঠিক একই জায়গায় থেমে থাকেনি, একটি বই থেকে অন্য বইতে পৌঁছবার পথে তাঁর বদলাবার ধরনটাও আমরা টের পাই। প্রথম দিকের স্মৃতিবিধুর টান অল্পে অল্পে কেটে যায় পরে, তার বদলে জেগে উঠতে থাকে একটা ঝাঁজ। ক্ষয়ের ছবির মধ্য থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে ভাবী সমাজের ইশারা, মহুয়া ফুলের আবেশ ছেড়ে দেখা দিতে শুরু করে 'তামাটে প্রান্তরে'র মানুষেরা, আর চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ক্লান্ত উর্বশী নৃত্যরতা হয়ে ওঠে 'কালের তপোভঙ্গে'। সময়ের একটা চাপ ছিল, ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাল ছিল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এক টাল-মাটালের সময়, তাকে লক্ষ করা অনিবার্য ছিল সমর সেনের পক্ষে। কিন্তু ঠিক যে-অর্থে সরল প্রগতির ভাবনাকে কবিতায় প্রতিফলিত দেখতে চান অনেকে, সে-অর্থে কবিতা লিখবার রুচি হয়নি তাঁর, বরং মনে হয়েছিল সেপথে আছে শুধু ভাবালুতা বা বাগাড়ম্বর। তরুণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতালেখা ছেড়ে দিয়েছেন ভেবে একচল্লিশ সালে যিনি বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন 'দুর্যোগে কে আর বাঁশি বাজাবে', পরের বছরের শেষে সেই তিনি লিখছেন : 'সুভাষকে গতবারে কলকাতায় বলেছিলাম যে কী যুদ্ধে কী কবিতায় সবচেয়ে দরকারি জিনিস হলো defence in depth, Maginot Line নয়। কয়েকটি সাম্প্রতিক লেখা পড়ে আমার ও ধারণা বদ্ধমূল হলো'। এ মন্তব্যের লক্ষ্য নিশ্চয় 'চিরকুট'-এর কোনো কোনো কবিতা। পঞ্চান্নজন কবির ফ্যাসিস্টবিরোধী কবিতাসংকলন 'একসূত্রে'কে যে তাঁর Waste and void মনে হয়েছিল, তাও হয়তো এই ম্যাজিনো লাইনের প্রখরতা দেখেই। কেবল বুদ্ধদেবকে নয়, ও-বই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-কেও তিনি লিখেছিলেন বাঁকা সুরে : 'আপনারা বেশ আছেন। আপনারা জনযুদ্ধের বক্তা হিসেবে বাংলা কাব্যে যে বিপ্লব এনেছেন তার পরিচয় 'একসূত্রে' পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত আছি।'

চলতি প্রগতিপন্থী কবিতাবিষয়ে তাঁর আপত্তির, কিংবা সাধারণ-ভাবেই বামপন্থীদের নিয়ে তাঁর অসহিষ্ণুতার একটা কারণ ছিল এই যে সমর সেন ভেবেছিলেন : কথা আর কাজের কোনো সামঞ্জস্য নেই কবিদের জীবনে। তীব্রভাবে আত্মসচেতন তিনি, এবং ইতিহাসচেতন; মার্ক্সবাদে তাঁর নির্ভরতা; তবু বিষ্ণু দে-কে চিঠিপত্রে প্রায়ই লেখেন এইসব কথা : 'আপনারা যে রেটে বামপন্থী হচ্ছেন তাতে অশোকবাবু এবং আমি বিচলিত এবং চিন্তিত' '....গালিগালাজ....আধুনিক বাংলা প্রগতিসমালোচনার অন্যতম বিশেষত্ব' '...বামপন্থী বন্ধুরা যা বলতেন সেটা নির্বোধের আক্রোশ' 'বামপন্থী বন্ধুরা চুপ, দেশের অরাজক অবস্থায় তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কফিহাউসে সময় কাটাচ্ছেন'। ১৯৫৮ সালে 'In Defence of the Decadents' নামের যে-প্রবন্ধটি নিয়ে একটা আবর্ত উঠেছিল, সেখানে সমর সেন লিখেছিলেন : 'We must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living'। এই কথারই প্রতিধ্বনি এসে পৌঁছয় কখনো বিষ্ণু দে-কে লেখা চিঠিতে ('আপনারো জীবনযাত্রা বদলানো উচিত'), কখনো-বা 'তিন পুরুষ'-এর কবিতার ব্যঙ্গে :

জীবনযাত্রার গতি বদলাতে তাই
বিশেষ আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও দেখি না।

ম্যাজিনো লাইনের মধ্যে যদি সেই অগভীর আস্ফালন থাকে, তবে কবিতার 'ডিফেন্স ইন ডেপ্‌থ' পাওয়া যাবে কোন্ পথে? সমর সেনের কবিতায় যে এর কোনো চূড়ান্ত উত্তর আছে তা নয়, তবে এটা লক্ষণীয় যে সময়বদলের সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ছন্দোরূপও খানিকটা পালটাচ্ছিল। স্মৃতি থেকে ভবিষ্যতে এগোবার পথে, সংশয় থেকে আশ্বাসের পথে যত তাঁর নির্ভরতা বাড়ছিল, ততই বাড়ছিল একটা অন্তশ্ছন্দের প্রবণতা। 'তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসত্তাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে' : প্রথমদিকের কবিতা বিষয়ে বিষ্ণু দে-র এই অনুযোগ হয়তো

এ-ব্যাপারে কিছু কাজ করেও থাকতে পারে। সমর সেনের গদ্যছন্দ বিষয়ে যে সাধারণ ধারণাটির প্রচলন আছে, সেটাকে ভেঙে দিয়ে অল্প খানিকটা ছন্দোবদ্ধতায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন কখনো কখনো। এক হিসেবে হয়তো ওর মধ্যেও ছিল তাঁর 'ডিফেন্স ইন ডেপ্‌থ্‌'-এর প্রস্তুতি।

দ্বিতীয় কবিতার বই থেকেই গদ্যছন্দের ভিতরে ভিতরে দেখা দিতে শুরু করেছিল এইসব লাইন : 'বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী' 'পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই' 'বিকেলের আলো ঝরে, সোনালি চোখের রঙ / মেঘে মেঘে প্রতিদিন মৃত্যুহীন সৌন্দর্য ঘনায়' 'নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা' 'কিছু দূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য' 'ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে' 'নিঃসঙ্গ বট / যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত' এবং পরের বইগুলিতে এ-রকম আরো বেশ কিছু। অক্ষরবৃত্তের চালে বসানো এ লাইনগুলি এতটাই ছন্দের আশা জাগায় যে বিষ্ণু দে এই তালিকার প্রথম লাইনটিকে আরো একটু প্রথাসিদ্ধ প্রসারে দেখতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন 'বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ মহানদী'র মাপসই আঠারো মাত্রা। ছন্দ-অছন্দের মধ্যে একটা অনায়াস-গম্যতা রাখতে চেয়েছিলেন বলে সমর সেন নিশ্চয় ইচ্ছে করেই লিখেছিলেন 'নদী', ষোলমাত্রায় থামিয়ে দিয়েছিলেন লাইন, সিগনেট-সংকলনে ছাপবার সময়েও বিষ্ণু দে-র পরামর্শকে তত আর গণ্য করেননি। পরামর্শ গণ্য না করার আরো একটি বড়ো উদাহরণ আছে তাঁর 'ক্রান্তি' কবিতার দ্বিতীয় অংশে। বিয়াল্লিশের আন্দোলন শুরু হবার পর দেশব্যাপী সরকারি জুলুমের মূর্তি দেখে, দিল্লির রক্তস্নান দেখে, চাঁদনি চকে স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট জনসভার আয়োজন দেখে 'পিঁপড়ের পাখা' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন তিনি, সেইটেই 'ক্রান্তি'র দ্বিতীয় অংশ। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার জন্য পাঠাবার পর বুদ্ধদেব সে-কবিতার যে পরিমার্জনা করেছিলেন, তাতে বোঝা যায় সমর সেনের লক্ষ্যটা তাঁর কাছেও খুব স্পষ্ট ছিল না। গদ্যছন্দে লেখা সেই কবিতাটির মধ্যবর্তী কোনো কোনো লাইন ছিল স্পষ্ট অক্ষরবৃত্তের ছাঁদে বাঁধা : 'মাঝে মাঝে বিচলিত

অন্ধকারে প্রহরীর ডাক/রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে', আর সেইটে দেখেই হয়তো বুদ্ধদেব পুরো কবিতাটিকেই পালটে দিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্তে। এ কবিতা দেখেও কি তিনি ভাবছিলেন যে ছন্দের হাত টলোমলো বলেই বাকি অংশগুলিতে ছন্দ আনতে পারেননি সমর সেন? কবিতাসংগ্রহে কবিতাটি ছাপা হবার সময়ে সমর সেন কিন্তু তাঁর পুরোনো গদ্যপদ্যের মিশ্র মূলটিতেই ফিরে গেছেন আবার, বুদ্ধদেবের শোধিত দুএকটি লাইন মেনে নিতে যদিও তাঁর আপত্তি হয়নি।

কেবল মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তী একটিদুটি লাইনে নয়, 'তিন পুরুষ' পর্যন্ত পৌঁছে আমরা বেশকিছু কবিতা পেয়ে যাব যা পুরোপুরিই ছন্দে লেখা, এবং অনেকসময়ে তাতে মিলও আছে। ততদিনে, প্রায় দশ বছরের গদ্যছন্দ চর্চার পরে, পুরোনো সেই টলোমলো হাতেরই যখন ব্যবহার করছেন আবার, তার পিছনে নিশ্চয় এবার কোনো পরিকল্পনার জোর ছিল। তখন আমরা দেখি 'স্তোত্র'র মতো কবিতা, যেখানে লাইন সাজানো আছে প্রায় শ্লোকের চেহারায়, যেখানে মহাজন আর চাষীর সম্পর্কসূত্রে আসে এইসব কথা :

সাপ যত বসে আছে শিকারের তালে।
রাত্রি এল, মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে॥
মহাজন গান গায়, নদারৎ ধান।
অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান॥
অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বরকথনে।
প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে॥

একে কারো হঠাৎ মনে হতে পারে ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দোজগতে ফিরে যাওয়া, যেমন একবার মনে হয়েছিল বুদ্ধদেবের। কিন্তু বহমান সামাজিক শঠতাকে আক্রমণ করবার জন্য, ব্যঙ্গকে ধারালো করবার জন্য, শ্লোকবদ্ধ এই পুরোনো কাব্যরূপ (অথবা এর তুল্য আরো নানা ধরন) তো কখনো কখনো একটা শক্তি হয়েই আসতে পারে? তারই একটা চেষ্টা আছে বলে এসব লেখা কবির ফর্ম-সচেতনতারই পরিচয় দেয়। এই

একটিমাত্র কবিতা নয়, কালের-যাত্রা[১] অকাল বাবুবৃত্তান্ত[২] বিকলন ২২শে-জুন[৩] গৃহস্থবিলাপ নাচিকেত—এই সবই সেখানে পূর্ণ ছন্দে গাঁথা হয়ে আসে। এর মধ্যে পরিকল্পনা কতটাই স্পষ্ট তা আরো বোঝা যায় যদি লক্ষ করি যে 'গৃহস্থবিলাপ'-এর পাঁচটি অংশ সাজানো আছে ১/৩/৫ আর ২/৪-এর স্বাতন্ত্র্যে ; ১/৩/৫ ছন্দোময় আর ২/৪ আছে ছন্দে-অছন্দে মেলানো তাঁর নিজস্ব ধরনে।

৪

গদ্যছন্দ থেকে ঈষৎ ছন্দোবদ্ধতায় এগোবার এই ইতিহাসের একটা তাৎপর্য হয়তো আছে। অনেকসময়ে আমরা ধরে নিই যে সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ জীবনের কথা বলবার জন্যই দরকার হয় গদ্যকবিতার, যেন বাস্তবতার দাবির সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে গদ্যছন্দের। ছন্দ বা মিলকে অনেকসময়ে আমরা ধরে নিই কৃত্রিম আর শিল্পিত, সেখানে কেবল রোম্যান্টিকতার বা ভাবালুতার প্রশ্রয় আছে বলে ভাবি, তাকে ছেড়ে দিয়ে দৈনন্দিনে পৌঁছতে চাই বলেই আধুনিক সময়ে গদ্য-ছন্দকে অনেকে ভাবেন অপরিহার্য। কিন্তু এই ধারণার মধ্যে একটা মস্ত ভুল আছে মনে হয়। গদ্যছন্দ যে-দৈনন্দিনকে ধরে, সে হলো একধরনের মধ্যশ্রেণীর দেখা মধ্যশ্রেণীর জগৎ। এর সমস্ত শিল্পসম্ভাবনার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে গদ্যছন্দের মধ্যে বরং এক বৃত্তবদ্ধতাই আছে, আছে ঈষৎ এলিটিজ্‌ম্-এরও ছোঁয়া। সহজ মানুষের রক্তের মধ্যে যে দোলা বা ছন্দের জন্য প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা আছে, সেটা সাড়া পায় বলেই অদীক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে লৌকিক ছন্দের এতটা টান হতে পারে। পথ-চলতি মানুষ সেই ছন্দের আলোড়নে বরং অনেক বেশি ছুঁতে পায়

১ এ কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'য় বর্জিত।

২ 'আনন্দমঠ' নামে এর প্রথম সাতটি লাইন আছে চলতি বইতে, বাকি সাতাশ লাইন বর্জিত।

৩ 'তিন পুরুষ'-এর পাঠে এ কবিতার কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

দৈনন্দিনকে।

দেশে-দেশান্তরে 'তান্ত্রিক স্তব্ধতা'র পরিবেশের মধ্যে যেখানে এখনো নবাবী আমলের পেয়ালা বাজে, সেখানে সমর সেন কেবলই বলতে চান 'আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে দাও'। শ্রেণীত্যাগে বাঁচবার আশা আছে বলে, কর্মী মানুষের সাধারণ্যে আর বিশ্বাসে ফিরতে চান বলেই 'এক একদিন যন্ত্রসংগীতের শব্দ স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে'। যতই এসে পৌঁছয় 'পুনরুজ্জীবনের বার্তা সাধারণ লোকের' ততই সরে যায় স্তব্ধতা। তখন ছন্দোহীনতা থেকে ছন্দের দিকেই এগোবার ইচ্ছে হয় তাঁর। 'গৃহস্থবিলাপ' কবিতার সবটাই তখন আর বিলাপ থাকে না, ছন্দোবদ্ধ অংশগুলিতে দেখা দেয় সংকল্পের উচ্চারণ, 'আমার পরমা যতি' হিসেবে যথার্থ 'কালের সারথি'দের 'দোস্তি' খোঁজার কথা।

কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে জীবনযাপনের কি সামঞ্জস্য করতে পারেন তিনি? ইচ্ছের সঙ্গে অভ্যাসের সামঞ্জস্য? যাপনের যে 'reconstruction'-এর কথা তিনি লিখেছিলেন ১৯৩৮ সালের প্রবন্ধে কিংবা ১৯৪৩ সালের চিঠিতে বা কবিতায়, তাঁর নিজের জীবনে কি পাচ্ছিলেন সেটা? বিষ্ণু দে যখন মণীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু' বইটির সমালোচনায় লিখেছিলেন যে তাঁর কাব্যচৈতন্য 'মার্ক্সিস্ট অবৈকল্য' বা 'চৈতন্যের অখণ্ডতা' পেয়েছে, সে-কথাগুলিকে তখন পরিহাসই করেছেন তিনি। বিষ্ণু দে-কে লিখেছেন 'মার্ক্সিস্ট অখণ্ড চৈতন্যের কথা কী লিখেছেন....চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে হয়েছে'; বুদ্ধদেবকে লিখেছেন 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৯ই অগস্টের পর মার্ক্সিস্টদের "অখণ্ড সত্তা" কিছু আলোড়িত হয়েছে'; আর সমকালীন 'তিন পুরুষ'-এর 'সাফাই' কবিতায়:

আর্টের কৈবল্য শুধু, অখণ্ড চৈতন্য শুধু,
আত্মচর্চার ধারালো সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে
প্রাণের গম্বুজে আমার এ যাত্রা
আমার এ উর্ধ্বগতি সবাই দেখুক,
প্রগতিকেরা বিশেষ করে; দিক হাততালি।

এসব বলেছেন বটে, কিন্তু এও ঠিক যে তিনিও 'ক্রান্তি'র মতো কবিতায় কারখানার সংঘবদ্ধ ভিড়ের সামনে বলতে চান 'তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার/এ প্রার্থনা আমার'। অখণ্ডতা যে কোথায় সেটা বুঝবার জন্য, সেই সত্তার দিকে এগোবার আগ্রহেই লেখা হতে পারে তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতার এইসব লাইন—কালের যাত্রায় তিন পুরুষের মধ্যে এই তৃতীয় পুরুষের সম্ভাবনা—

প্রায় পথের ভিখিরি, চালচুলোহীন,
অতীত সঞ্চিত গ্লানি ঘষ অসংকোচে
সে মুছবে, আশা করি বজ্রগর্ভ ভবিষ্যতে
নতুন বিপ্লব গান সমষ্টি আসরে
সে শুনবে। কালরাত্রি দীর্ণ ক'রে দিনের মজুর
লোহিত সকাল আনে প্রায় বেকসুর।

লেখেন বটে এসব কথা, কিন্তু কবিতার স্বরে ঠিক সংগতি আসে না। সেদিনকার তরুণ কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় একটা আপত্তি তুলেছিলেন এই বলে যে 'প্রায় পথের ভিখিরি'-র ২-৩-৩ অক্ষরবিন্যাস 'পয়ারের প্রায় অসীম সহিষ্ণুতা'কেও যেন টপ্‌কে গেছে। ছন্দের স্বাভাবিক চালের মধ্যে ইচ্ছে করেই কিছু উপলবন্ধুরতা আনছেন ভেবে একে হয়তো একরকম সমর্থন করাও চলে, কিন্তু তবু সত্যি যে এ লেখায় ছন্দের টলোমলো ভাবটাও ফুটে ওঠে 'সে মুছবে' 'সে শুনবে' অংশগুলিতে। লোকপরিচিত ছন্দের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন কবি, কিন্তু এর ওপর তাঁর দখল সম্পূর্ণ হয়নি তখনো। ওই কবিতাংশের বিরুদ্ধে আরো একটা বড়ো আপত্তি হতে পারে তাঁর নিজেরই বলা সেই ম্যাজিনো লাইনের কথায়। কবিতার শেষ লাইনে 'লোহিত সকাল'টি যেন সযত্নচেষ্টিত সেই ম্যাজিনো লাইন, বেশ বানানো ঠেকে সেটা। এর তুলনায় অনেক সত্য 'ডিফেন্স ইন ডেপ্‌থ্‌' ছিল বরং আদিপর্বের 'ইতিহাস' জাতীয় কবিতার সেইসব সকাল, যেখানে বলা যায়

তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এসো,
যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে

যেখানে আসে রাত্রের পাহাড়ে ঘননীল আভাস
নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
আর তারারা জ্বালে তীব্র, নীল আগুনের শিখা
আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।

যেখানে ক্লান্তি অন্ধকার রাত্রি নিঃসঙ্গতার মধ্যে জড়িয়ে আছে বলেই এই সকালটা আর সাজানো লাগে না, হয়ে ওঠে একেবারে প্রাকৃতিক।

নিছক সাধারণের জীবনকে ধরবার যোগ্য কোনো ভাষাছন্দের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন কবি সমর সেন, কিন্তু সেই ভাষাছন্দ ঠিকমতো তাঁর অধিকারে আসেনি, কেননা মধ্যশ্রেণীর গণ্ডির মধ্যে কাটছিল তাঁর জীবন। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ভাষায় তিনি লিখতে পারতেন আরো কবিতা, কিন্তু সেই কবিতায় তাঁর রুচি ছিল না, কেননা কাজে-ভাবনায় সমন্বিত নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে। 'কৃত্তিবাস'-এর যে-প্রবন্ধটির কথা বলেছি আগে, সেখানে তিনি লিখেছিলেন 'গোষ্ঠী থেকে সমাজে বেরোবার তাগিদ'-এর কথা। নতুন চীনের আবির্ভাবে, রুশ ফরাসি তুর্কি চিলির কবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে একটা বিস্তার আর মানবিকতার প্রকাশ হয়তো দেখা যাবে বাংলা কবিতায়, লিখেছিলেন এই তাঁর প্রতীক্ষার কথা। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর কবিতায় পুরোনো অভ্যাস আর নতুন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো শিল্প-সামঞ্জস্যে পৌঁছতে পারছিলেন না বলে বিদায় নিলেন সেই জগৎ থেকে।

আর এই বিদায় নেওয়ার মধ্যে আছে তাঁর সেই সাহসিক পুনর্নির্মাণের ইঙ্গিত, তাঁর সেই বহুপ্রত্যাশিত reconstruction। 'সমর সেনের কবিতা' বইটির বিখ্যাত শেষ লাইন ছিল 'বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে'। ভিন্ন অর্থে সত্যি হয়েছে এই লাইন। তাঁর অস্তিত্বের পুরোনো অভ্যাস আর নিরাপত্তা-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত অংশটিকে তিনি

নির্বাসনে দিয়েছেন কাশীধামে ; আর পুনর্নির্মীয়মাণ এক সত্তায় নিজেকে তিনি লিপ্ত করেছেন তাঁর স্বপ্নেদেখা সমাজসৃষ্টির কাজে, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদনায়। ঝড়ের যে নিঃশব্দ সঞ্চারণের কথা ছিল প্রথম কবিতার বইতে, শব্দের তীব্র আঘাতের যে প্রতীক্ষা ছিল, তার একটা সাময়িক আসন্নতা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চার পাশে, সত্তরের দশকের উদ্‌বেলতায়। কবিতার জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরে গিয়ে এই উদ্‌বেলতার সঙ্গে যেভাবে নিজেকে তিনি মিলিয়েছিলেন, তাকেও বলা যায় একটা সৃষ্টিরই জগৎ, সংঘাতের আন্দোলনের উদ্দীপনার সৃষ্টি। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের মতো তরুণতর কোনো কবি তাই বলতে পারছিলেন 'এখন কেবল ফ্রন্টিয়ারে গদ্য পড়ি সমর সেনের', কবিতা-থেকে-সরে-আসা সমর সেনের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন আরেকরকম প্রেরণা ; তাঁদের জীবনের, তাঁদের স্বপ্নের প্রেরণা। তাই কবিতার জগতে তাঁর দীর্ঘকালীন নীরবতার মধ্যেও একটা ছন্দ থেকে যায়, পুনর্নির্মাণের সেই ছন্দ, আর সেদিকে তাকিয়ে তাঁর প্রথম কবিতাটির মতো আমরাও হয়তো বলতে পারি : 'মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি/তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ'।

১৯৮৮

স ং যো জ ন

প্রথম শিথিল ছন্দোমালা

মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র আগে ইয়েট্‌স নাকি বলেছিলেন, কীভাবে লিখতে হয় তা সবে তিনি বুঝতে শুরু করেছেন। এই কথাটির মধ্যে তাঁর কবি-বান্ধবী অবশ্য দেখেছিলেন আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। কেননা, মনে হয়েছিল ডরোথি ওয়েলেসলির, কোনো কবি বা শিল্পী যখন এমন উচ্চারণ করতে পারেন তখনই ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর সৃষ্টি এবার সীমায় এসে থামল। পূর্ণ অধিকার বা পরমা সিদ্ধির বোধ তৈরি হওয়া মানেই ভিতরের আগুন নিভে যাওয়া, সমস্ত লড়াই তখন শেষ। ডরোথি ওয়েলেসলির তাই ভয় হয়েছিল যে ইয়েট্‌স তাঁর অবসানে এসে পৌঁছলেন এবার।

বিশেষ ওই মানুষটিকে নিয়ে এ ভয়ের কোনো কারণ ছিল কি না, সেটা অবশ্য ভিন্ন বিচারের বিষয়। অন্তত এ তো আমরা দেখতে পাই যে মৃত্যুর দুদিন আগেও শুয়ে শুয়ে এই কবি বলে যাচ্ছেন কিছু সংশোধনের কথা, তাঁর শেষতম লেখাগুলি নিয়ে তখনও ঠিক নিশ্চিত নন তিনি। জানি না, হয়তো বা লড়াই থামেনি তখনও। কিন্তু ইয়েট্‌সের কথা ছেড়ে দিলে, ডরোথির ওই মন্তব্যের মধ্যে যে সাধারণ সত্যটি লুকিয়ে আছে তাকে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। মনে হয়, বিক্ষোভের অবসান মানেই সৃষ্টিরও অবসান। আত্মতৃপ্তির শান্ত মসৃণতা কবিতার পক্ষে মর্মান্তিক।

রবীন্দ্রনাথ কি সেই মসৃণ ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর শেষ জীবনে? নিশ্চিত জেনে গিয়েছিলেন, কীভাবে লিখতে হয়? আমাদের দেশের ইতিহাসের ভূমিকায় দেখলে মনে হবে, তাঁর সিদ্ধির আশ্চর্য পরিমাণের উপর ভর করে সে-রকম কোনো তৃপ্তির বোধ অসংগত হতো না তাঁর পক্ষে। তেমন-কোনো ক্ষণিক মুহূর্ত যে দেখা যায় না তাঁর বিশাল রচনাজগতে তাও নয়, ছবির কথা বলতে গিয়ে কখনো লিখে-

ছিলেন বটে যে এর তুলনায় ভাষা বরং অনেক বেশি আয়ত্তে আছে তাঁর। লিখেছিলেন, 'তাঁর সমস্ত কৌশল তার গতিবিধির নিয়ম সে এক রকম জেনে নিয়েছি।' কিন্তু তবু, বাক্যের সৃষ্টির উপবেও সংশয় এসেছিল তাঁব, বলতে হয়েছিল যে তখনও তাঁব জানা হলো না কিছুই, বোঝা হলো না কিছুই। আমি কোনো দার্শনিক ভাবনার প্রসঙ্গ তুলছি না এখানে, তুলছি কেবল শিল্পীর সমস্যাব কথা, যে সমস্যায় একজন শিল্পী তাঁর উপাদানগুলিকে উপকরণগুলিকে বশে আনবার জন্য কেবলই যুদ্ধ করে যান। যখন দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ছন্দের শব্দের প্রতিমার বিচিত্রতম ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তিনি, যখন অনায়াস ছন্দে অনায়াস বাক্যবন্ধ আপনিই এসে যায় হয়তো, তখনও তাঁকে আহত আর্তনাদে বলতে শুনি 'ভাষা নাই ভাষা নাই' অথবা 'স্বর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে/ভাষা পাই নাই'। এই আক্ষেপ থেকে তখন তিনি আমাদের সামনে এনে দিচ্ছেন কোনো পূর্বব্যবহৃত সম্পদ নয়, দিচ্ছেন এক নতুন সংহত কবিতাগুচ্ছ, যেন আরো একটা নতুন পরীক্ষা, বাহুল্যঝরানো তাঁর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা। জীবনের শেষ দশ মাসে দেখা দিল এই মালা, 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' 'জন্মদিনে' আর 'শেষ লেখা'র কবিতাগুচ্ছে।[১] কবি তখন অশক্ত, রোগে জীর্ণ, লিখতে গেলে হাত কাঁপে, অনেক সময়েই নির্ভর করতে হয় অন্যের ওপর। কেবলমাত্র সেইজন্যেই কি ছন্দ-মিলের চমকবিহীনতা নিয়ে কবিতাগুলি হয়ে এল এমন ছোটো-ছোটো? অগত্যা? সেবাময়ী নারী দুটির উদ্দেশে তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর 'অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা'। কিন্তু এর ফলে যে কবিতাশরীর তৈরি হলো সে কি কেবল অপটুতারই জাতক? নাকি এ শিথিলতাও ইচ্ছাকৃত? এতদিনের অভ্যাসের রোমন্থন হিসেবে উঠে আসছিল এই রচনা? না কি এরও মধ্যে কাজ করছিল কোনো স্রষ্টার এক সতর্ক নির্মাণ? আমরা ভুলব না নিশ্চয় যে এই কবি কদিন

১ কেবল মনে রাখতে হবে এইটুকু যে 'জন্মদিনে'র বেশ কয়েকটি কবিতা এই বৃত্তের বাইরে, সেগুলি তাঁর অল্পকিছু আগের দিনের লেখা।

আগেই জানাচ্ছিলেন আরেক তরুণ কবিকে, 'কবিতারচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের দ্বারা যাকে সহজ দেখায় সে আবর্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য।'

পুরী থেকে লেখা একটি চিঠিতে (২৩ এপ্রিল ১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছিলেন তাঁর পুরোনো দিনের ছন্দের সঙ্গে আজকের দিনের ছন্দ-ব্যবহারের। এ-তুলনা কোনো বাইরের ধ্বনির তুলনা নয়, এ-তুলনার ভিত্তি আছে ছন্দের অন্তঃসারে। 'হে আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার'-এর মতো কবিতা যখন লিখেছিলেন একদিন, 'সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল—তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেবার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা।' আর এখন? এখন 'সমুদ্রের প্রাণটা যেন পাণ্ডুবর্ণ, নীলিমার নিবিড়তা নেই এর জলে, ঢেউগুলো কি আমারি বুকের রক্ত-দোলনের মতো হাঁফধরা, শ্রান্ত এর একঘেয়ে শব্দ, আর ঐ সারবাঁধা ফেনার পদবন্ধ, নির্জীব পয়ারের চোদ্দ অক্ষর বাঁধা লাইনের মতো তটের উপর গড়িয়ে পড়ছে পুনঃপুনঃ।' তাই কবি জানেন যে এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্‌বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফলফলানোর নিগূঢ় আবেগ।'

আত্মসমাহিত এই নিগূঢ় আবেগ প্রকাশ করবার জন্য, তাঁর শেষ কবিতাগুলিতে কবি তৈরি করলেন এক ক্ষীণ স্রোত, নির্জীব পয়ারকেও টুকরো করে ভাঙা। সেখানে ছন্দ কোনো জমকালো আওয়াজ দেয় না আর, লাইনগুলো খাটো হয়ে আসে প্রায়ই ধীর আর দুর্বল নিঃশ্বাস-পাতের মতো, কবিতার মাপও হয়ে আসে ছোটো। নিজের 'ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস', তার মধ্যে কেবলই দেখছেন তিনি 'অবরুদ্ধ ভাষা' 'বাণীর ক্ষীণতা' অথবা 'রুগ্‌ণ বাণী'। ব্যক্তিগত শীর্ণতার সঙ্গে এখন মিশে গেছে পৃথিবীর বিপর্যয়ের ছবি, সংখ্যাহীন অপচয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে কেঁপে ওঠে মন। 'রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোত' ঘিরে ধরছে তাঁকে, মনে হচ্ছে আজ তাই 'কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত'। কিন্তু অন্যদিকে বিশ্ব-প্রকৃতিতে আজও আছে প্রকাণ্ড সুষমা, যেখানে 'ছন্দ নাহি ভাঙে তার

সুর নাহি বাধে' অথবা যেখানে 'বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান/ধরণীর প্রাণের আহ্বান'! না-এর আঘাত লেগে আজ আরো বেশি ছন্দোময় হয়ে উঠছে জীবনের টান। তাই একদিকে 'অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে' মেতে ওঠা এই সৌরজগৎ, অন্য দিকে আছে 'অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা'। এই বিপরীতের ওতপ্রোতেই তাহলে তৈরি হচ্ছিল তাঁর শেষদিনের লেখাগুলি।

২

কিন্তু শিথিলতা ছিল কোথায়, কী অর্থে?

কয়েক বছর জুড়ে গদ্যছন্দ লিখে যাবার পর কবি আবার ভর করেছিলেন ছন্দের উপর। কেবল ছন্দ বলাটাই যথেষ্ট হলো না, গদ্যছন্দকে প্রায় প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছিলেন তিনি মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের মতো ঝংকৃত ছন্দেও। 'ছড়ার ছবি' বা 'প্রহাসিনী' ধরনের বইগুলির কথা যদি ছেড়েও দিই, তবুও দেখা যাবে 'নবজাতক' 'সানাই' বা 'সেঁজুতি'র ছন্দ দেখা দিচ্ছে এক উল্লাস নিয়ে, যেন ফিরে এসেছে তাঁর পুরোনো দিনের মাতিয়ে তোলার ঝোঁক, অথবা যেন প্রমাণিত হচ্ছে তাঁর এই স্বীকারোক্তি যে 'দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব'। সে-স্পর্ধা যখন অক্ষরবৃত্তে দেখা দিত, 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না' ধরনের 'মহুয়া'র টান তখন ফিরে আসত আবার, 'প্রান্তিক'-এর আঁটো-সাঁটো অক্ষরবৃত্তে তার একটি দিশা পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ চতুষ্কে হঠাৎ পালটে গেল এই সুর, নিতান্ত দুর্লভ হয়ে এল মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত[২], আর অক্ষরবৃত্তেরও স্পন্দে এল এক সূক্ষ্মচালের বদল।

খোলা অক্ষরবৃত্তে লাইনগুলি যে নানা মাপের হতে পারে তা সকলেই জানেন। নানা মাপের, কিন্তু তারও মধ্যে একটা লুকোনো বিধি কাজ

২ 'নবজাতক' 'সানাই' আর 'সেঁজুতি'তে সব মিলিয়ে কবিতা আছে ১১৭টি, আর শেষ চতুষ্কে ১১৬। মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত আর অক্ষরবৃত্তে প্রথমটির হিসেব হলো ৪৯-২৬-৪২, পরেরটি ৩-৫-১০৮। অনুপাতটা লক্ষ করবার মতো।

করে যায়। আট মাত্রার চেয়ে বড়ো যদি হয় লাইন, তবে সে দশ চোদ্দ আঠারো বাইশ ছাব্বিশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে সহজেই, কেবল সে এড়িয়ে যেতে চায় বারো ষোলো কুড়ি বা চব্বিশ। কেন? কেননা এই ছন্দ দুটো সমান ভাগের প্রত্যাশী নয়, দুটো অসমান মাপের সংঘাতেই তৈরি হতে পারে এর চরিত্র। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস সেইদিকেই টেনে নিয়ে যায় পাঠককে।

এ কথার মানে এ নয় যে বারো ষোলো কুড়িতে কেউ থামিয়ে দেবেন না লাইন। গিরিশচন্দ্রের ভাঙা অমিত্রাক্ষরে বারোর চাল পাওয়া যেত প্রায়ই, আজকের দিনের কবিরাও অনায়াসে নিয়ে আসেন ও-রকম পঙ্‌ক্তি। আর এর ফলে, সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন, কবিতায় দেখা দেয় একটা কাটা-কাটা তাল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে ছিলেন সুষমারই পক্ষপাতী, দুমাত্রার বেশি-কমকে অস্বস্তিজনক বলেই ভাবতেন তিনি। 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতার একটি লাইনে দুমাত্রা বেশি দেখে কৃষ্ণদয়াল বসু যখন অনুযোগ জানাচ্ছিলেন তাঁর কাছে, কবি তখন (সেপ্টেম্বর ১৯২৫) ব্যাপারটাকে অনবধানজাত বলেই মেনেছিলেন। কথাটা এ নয় যে বারো মাত্রা বা কুড়ি মাত্রা কখনোই লেখেননি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সন্দেহ নেই যে তার প্রয়োগ ছিল বিরল, কেননা এক সময়ে একে তিনি ভাবতেন একেবারেই 'অনাহূত, অনধিকারপ্রবেশ'।

এ কথা যদি মনে থাকে, তবে 'রোগশয্যায়' বইটি খুলে আমাদের অবাক লাগতে পারে। কবিতাগুলির মাপ ছোটো, পঙ্‌ক্তিমাপও অনেক সময়েই ছয় আট দশ মাত্রায় ঘোরে, আর তারও চেয়ে বড়ো কথা যে অল্প কয়েকটি কবিতার মধ্যেই অন্তত আঠারোবার আমরা পেয়ে যাই বারো মাত্রারও প্রয়োগ। এর সঙ্গে যদি মিলিয়ে নিই এই তথ্য যে তাঁর অন্তিম কবিতাটিতে কয়েক লাইনের মধ্যে আছে এ-রকম তিনটি নমুনা— আর একটি ষোল—তাহলে হয়তো ধরতে পারব যে শিথিলতা রচনার এও ছিল এক ধরন, প্রত্যাশিত অসমভাগের দৈর্ঘ্য না পেয়ে, হঠাৎ যেন একটা যতি তৈরি হয়ে যায়, কবিতার মধ্যে চলে আসে একটা থমকানো সুর।

একদিকে যেমন এই, অন্যদিকে তেমনি আবার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দীর্ঘতম কয়েকটি লাইনের বিন্যাসও আছে এই রচনাগুলিতেই। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে এই কবির পক্ষে অক্ষরবৃত্তের ঊর্ধ্বতম সীমা হলো আঠারো মাত্রা, 'বলাকা'র দু-একটি আকস্মিক উদাহরণ দেখান তিনি বাইশের ; কিন্তু শেষ চতুষ্কে আমরা বার ছয়েক ফিরে আসতে দেখব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনভ্যস্ত এই দৈর্ঘ্যকে। কোনো কোনো কবিতায় ছোটো ছোটো লাইনের পর হঠাৎ এই দীর্ঘতা একটা অভিপ্রেত বৈপরীত্য তৈরি করে যেন। যেন ব্যক্তিগত 'শিথিল ছন্দোমালা'র সঙ্গে বিশ্বজাগতিক 'অস্খলিত ছন্দসূত্রে'র একটা বাঁধন তৈরি হতে চায়। 'বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে/কী ভীষণ একা/বোবা তুমি, অন্ধ তুমি' এই চালে চলতে চলতে কবিতা শেষ হয় এই টানে পৌঁছে : 'ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।'[৩] রুদ্ধ ব্যষ্টি হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে ওঠে ব্যাপ্ত সৃষ্টির দিকে, নিরাশ্বাস হঠাৎ তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দেয় বহিরাশ্রয়ের পায়ে। ব্রুক্‌সের ভাষা ধার করে বলা যায়, এইভাবে যেন তৈরি হয়ে ওঠে এক ধরনের 'ল্যাঙ্গুয়েজ অব প্যারাডক্স'।

৩

আমি বলতে চাই যে প্যারাডক্স-জাত এই 'শিথিলতা'ও ইচ্ছাকৃত, সযত্নে নির্মিত। ১৯৪০ সালের অক্টোবরে যে অসুস্থতা থেকে শুরু হলো এই নতুন রচনাগুলি, তার ঠিক পাশাপাশি আমরা দেখব ভাষাগত অন্য এক কারুকাজের জগৎ। 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলিতে শব্দের দল যে রকম

[৩] ক্লান্তি ভয় বা সংশয় অনেক সময়েই দেখা দিচ্ছে এই শেষ চতুষ্কের কবিতাগুলিতে, কিন্তু বাইশ মাত্রার লাইনগুলি সবই দাঁড়িয়ে আছে তার উলটো দিকে, এটাও মনে রাখবার মতো। যেমন : ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল, সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে, আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয়, তোমাদের আবেষ্টন চলাফেরা চারিদিকে ঢেউ-ওঠাপড়া, ইত্যাদি।

ঝাপট দিয়ে চলছে, 'গল্পসল্প' বইতে যেমন উল্লাসের খামখেয়ালে মেতে উঠছে বাচস্পতির শব্দ কিংবা 'ছড়া'র মধ্যে যেমন 'মিলের চুমকি গাঁথা ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে' উছলে পড়ছে কৌতুক, তাতে একথা মনে করবার কারণ নেই যে গাণ্ডীব তুলবার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন বলেই এত অনবধান। নিজে ও-রকম বলেছিলেন বটে একবার, সেই বলার ওপর নির্ভর করে তাঁর শেষ কবিতাগুলির 'হাঁফধরা' শরীরকে ভুলভাবে দেখেওছেন কেউ। কিন্তু মনে হয়, সহজ ভাষায় সত্যের দিকে পৌঁছবার শেষ আয়োজন থেকেই তিনি আনছিলেন 'রোগশয্যায়' বা 'আরোগ্য'র 'নির্জীব' ধরনটিকে, আর এরই জন্য অন্য এক দিকে উপচে পড়ছিল তাঁর গদ্যের এতটা জৌলুস, অথবা ছড়ার এই তুমুল শব্দক্রীড়া। এ যেন ভাষাকে ছেঁকে নেবার এক চেষ্টা, এক রকমের ফিল্টার। এটা লক্ষ করতে হবে যে একেবারে একই দিনে তিনি লিখেছেন 'নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল'-এর মতো কবিতা আর 'গলদা চিংড়ি তিংড়িমিংড়ি লম্বা দাঁড়ার করতাল'-এর মতো ধ্বনিমুখ; 'তোমারে দেখি না যবে মনে হয়'-এর মতো তিনটি আর্ত আবিষ্ট সংহত রচনা আর 'তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে'র মতো ঘুলিয়ে-দেওয়া ছড়া। হয়তো এই দরকার থেকেই তাঁর এ-পর্বের ব্যবহৃত ডায়েরিগুলির মধ্যে ছড়ানো দেখি অনেক হালকা শ্লোক, দেখি 'সোজ্জালো ঝঞ্চারে পড়ি বীরবাহু যোক্ষণে'র মতো 'সম্মুখ সমরে পড়ি'র প্যারডি। সুধাকান্ত বিষয়ে একটি কৌতুকীতে কবি লিখছিলেন তখন: 'অনায়াসে ছন্দ আর মিল/কলমের মুখে তার করে কিলবিল।' তাঁর নিজের জগতের অনায়াসকে এইভাবে অন্য একটি পথ করে দিয়ে গহনতর রচনাগুলিতে আনছিলেন একটা আয়াসজাত আপাত সহজের মূর্তি।

কেন বলব আয়াসজাত?

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির ছবি দেখেননি এমন পাঠক কমই আছেন, সকলেই জানেন যে তাঁর রচনায় শোধনের অনেক চিহ্ন থেকে যায়। রোগজীর্ণতার ফলে এই মার্জনার প্রবণতা বা শক্তি কি কমে এসেছিল

শেষের দিকে? তুলনা করলে দেখা যাবে যে উলটোটাই বরং সত্যি। একদিন, পুরীর সেই সমুদ্রের মতোই যৌবনের উদ্দামতায় প্রবাহের আবেগ নিয়ে লিখে গেছেন কবি, অনিরুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্তির টান তখন অনেক বেশি, রচনাকালীন শোধনের পরিমাণ তুলনায় কম। আর আজ প্রকাশিত কোনো রূপকেই যথেষ্ট মনে হয় না তাঁর, পরিবর্তনে পরিবর্তনে আচ্ছন্ন হয়ে যায় পাণ্ডুলিপি, তার থেকে ক্রমশ গড়ে ওঠে তাঁর 'শিথিল ছন্দোমালা'। লেখা হয়, সে-লেখার অনুলিপি করেন কেউ, তার পরে তৈরি হয় প্রেস কপি। কিন্তু এর প্রতিটি স্তরেই বদলে যাচ্ছে শব্দ, বদলে যাচ্ছে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা, বদলে যাচ্ছে পঙ্‌ক্তিসজ্জা। হয়তো লিখেছিলেন

সজীব খেলনা যদি গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে
কী তাহার দশা হয় করি অনুভব

কিন্তু পরে দুটো স্ট্রোক দিয়ে ভেঙে দিলেন একে চার লাইনে, ছন্দ পালটাল না, পালটে গেল শুধু স্পন্দ। অসমান ছোটো লাইনগুলির মধ্য দিয়ে শোনা গেল একটা ক্লান্ত স্বর, থমকে থমকে বলা।

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব।

প্রথমে যা ছয় লাইনে লিখেছিলেন তাকেও পরে দশ লাইনের খণ্ডতায় ভেঙে দিচ্ছেন। ছিল :

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকালতরে ক্লান্ত উর্বশীর তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
পূর্বার্জিত কীর্তি তার অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
আকস্মিক ত্রুটিমাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
মানবের সভাঙ্গনে সেখানেও জেগে আছে স্বর্গের বিচার।

পরে সেটা হয়ে উঠল :

স্বরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকালতরে
ক্লান্ত উর্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
পূর্বার্জিত কীর্তি তার
অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
আকস্মিক ত্রুটিমাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও জেগে আছে স্বর্গের বিচার।

আবার অন্যদিকে, প্রথম আবেগে লেখেন হয়তো উনত্রিশ লাইন, কিন্তু বাহুল্য ভেবে ছেড়ে দেন তার অনেকখানি, কমতে কমতে সেটা হয়ে দাঁড়ায় পনেরো লাইনের এক কবিতা, 'দীর্ঘ দুঃখ রাত্রি যদি' রচনাটি যেমন। শব্দবদলের মস্ত হিসেব এখানে সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, এইটুকু বলা যায় যে, এমন-কী 'প্রথম শিথিল ছন্দোমালা'ও প্রথমে ছিল 'স্খলিত' ছন্দোমালা, এমন-কী এই উৎসর্গ-টুকরোটিরও রূপ-রূপান্তর হলো অনেকবার। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, ইয়েট্সের মতোই মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও মুখে মুখে তিনি বদল করেছিলেন তাঁর লেখাগুলিকে, ক্লান্তিহীন। 'প্রথম দিনের সূর্য'র মতো কবিতাও এক প্রযত্নে সিদ্ধ নয়, আর একেবারে শেষ লেখাটিতেও বলতে বলতে তাঁর কাটতে হচ্ছিল 'তোমার সভায় পায় সে যে/এই পুরস্কার' লাইন দুটি অথবা 'এই নিয়ে তার পরিচয়', কিংবা 'অক্ষয় ভাণ্ডারে' পালটে করতে হয়েছিল 'আপন ভাণ্ডারে'। শ্রীমতী রানী চন্দ আমাদের জানিয়েছেন যে, কবিতাটি রচনার পর কবি বলেছিলেন, 'কিছু গোলমাল আছে, ভালো হয়ে পরে ঠিক করব।' সেই পরের সুযোগ আর আসেনি বটে জীবনে, তবু পাণ্ডুলিপি দেখে জানা যায় যে, 'পরে'র আগেও কিছু শোধনের চিহ্ন থেকে গেছে ওই সৃষ্টিপথিক রচনাটিতে।

কেন এত অসন্তোষ? কেননা, কবিতা বাণীমাত্র নয়, কবিতা শেষ পর্যন্ত একটা সৃষ্টিকাজ। গদ্যকবিতার সময় থেকে গল্পের ভার, বিবৃতির ভার, বাণীর ভার জমে উঠছিল তাঁর কবিতায়। এখন, এই শেষ কয়েক মাসে, ওর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন বারবার। এমন নয় যে তা তিনি পারছেন সব সময়ে, কিন্তু তবু, যেসব অংশ ছেড়ে দিচ্ছেন তার পরিচয় জানলে বোঝা যায়, লেখা থেকে আজ কীভাবে তিনি মুছে নিতে চাইছেন বাণীভার, রেখে দিচ্ছেন শুধু স্বরভঙ্গি। 'প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোক' কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি সরিয়ে নিচ্ছেন এই লাইনগুলি : 'প্রত্যক্ষ যা আছে চারিদিকে/তাহারেই শেষ সত্য জানা মানুষের ধর্ম নহে/জ্ঞানদৃষ্টি ভাবদৃষ্টি তার/প্রত্যক্ষেরে অতিক্রম করি গিয়েছে বিশ্বের মর্মস্থলে।' কিংবা আবার, 'রোগ দুঃখে রজনীর নীরন্ধ্র আঁধার' কবিতার এই শেষ লাইনগুলি বর্জন করছেন নির্মমভাবে : 'হে সবিতা অপাবৃত করি দাও হিরণ্ময় দ্বার/ঘটনার বন্যাস্রোতে/ভাসায়ে চলেছে যারে/আবিলতা হতে তারে তুলে লও/তোমার উদয়রথে জ্যোতিঃস্নান করি/লভুক সে আপনার সত্যতম রূপ।' অতিবাচন নিয়ে কাটাছেঁড়ার এই শ্রম, তাঁর এই নিরন্তন দ্বন্দ্বের ধরন, খানিকটা বোঝা যায় অন্য একটি কবিতা লেখার ইতিহাস থেকেও। চৌত্রিশ লাইনে 'নবজাতক'-এর 'প্রজাপতি' কবিতাটি লিখে তাঁর ভয় হচ্ছিল 'জিনিসটা কি বেশি শুকনো এবং মেটাফিজিক্যাল হয়েছে।' ফলে তৈরি হলো এর আরেকটা চেহারা চুয়ান্ন লাইনে, কিন্তু তখন আবার মনে হলো এই দ্বিতীয় সংস্করণটাকে বাহুল্যদোষে পেয়েছে হয়তো। মনে হলো, 'হয়তো এসব জিনিস একটু কম বোঝানোই ভালো—কারণ এর ধর্মই হচ্ছে স্পষ্ট না বোঝানো।' গোয়টে থেকে এলিয়ট্ পর্যন্ত অনেকেরই সঙ্গে তাঁর মিল হবে এই ধারণায় যে 'art is perhaps most effective when imperfectly understood'। ওই কবিতার দুই পাঠের মধ্যে কোনটি ভালো তা নিয়ে রুচিভেদ হতে পারে, সেটা এখন বিবেচ্যও নয়, লক্ষণীয় কেবল কবির নিজের এই দ্বিধাটুকু : একদিকে 'মেটাফিজিক্যাল

শুকনো চেহারা' আর অন্য দিকে 'বাহুল্যদোষ'। কোনটিকে ছাড়বেন তিনি? 'নবজাতক' পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে তাঁর প্রথমটিকেই, ঝুঁকে পড়তে হয়েছে দ্বিতীয়ের দিকে। তবু এক সময় উলটে গেল দান। 'সানাই' বইতে বেশ কয়েকটি গানকে কবিতারূপ দেবার মধ্য দিয়ে অল্পে অল্পে তিনি চলে এলেন সংহতি আর রিক্ততার জগতে, এলেন 'রোগ-শয্যায়' 'আরোগ্য' বা 'শেষ লেখা'র কবিতায়, যার সাতাশিটি রচনার মধ্যে উনষাটটি লেখাই ছিল কুড়ি লাইনের কম, তাকে মেটাফিজিক্যাল নাম দেওয়া যায় হয়তো বা, কিন্তু শুকনো বলা চলে না কোনোমতেই।

৪

একজন চীনে না কি বলেছিলেন একবার, বারো লাইনে যা লেখা যায় না, সে-কবিতা না লেখাই ভালো। 'উড়ে চলে গেছে' শব্দকটিকে 'উড্ডীন' শব্দে পৌঁছে দিতে সাতদিন লাগিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আর এজরা পাউণ্ড 'ইন এ স্টেশন অব দি মেট্রো' কবিতাটিকে তিরিশ লাইন থেকে দু লইনে এনেছিলেন এক বছরের চেষ্টায়। এসব নিশ্চয় বাড়াবাড়ি। এমন-কী এডগার অ্যালেন পো-ও নিশ্চয় আপত্তি তুলতেন এতে, বলতেন অল্পেরও একটা সীমা আছে, এতটা সংক্ষেপ কবিতাকে নামিয়ে আনতে পারে 'এপিগ্রামাটিজ্‌মে'র দিকে। এই সবই সত্যি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে আধুনিক কাল চায় ভাবালুতার বর্জন, আড়ম্বরের অবসান। ইয়েট্‌স তাঁর মধ্যজীবনে একবার, অন্ত্যজীবনে আরো একবার খুঁজে ফিরেছিলেন সরলতার ভাষা, কবিতার শরীর থেকে খুলে নিতে চেয়েছিলেন পুরাণখচিত আঙরাখা। নগ্ন কবিতার স্পর্শ চেয়েছিলেন স্পেনীয় কবি হিমেনেথ। হয়তো এঁদের প্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে-রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন পর্বে দুই ভিন্ন পথে পৌঁছেছিলেন এই সহজতার দিকে, ছুঁতে চাইছিলেন কবিতার সারাৎসার, একবার 'গীতাঞ্জলি'র মুহূর্তে আর অন্যবার এই অন্তিম চতুষ্কে। একদিন ছিল 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার', আর আজ 'মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডু-

নীল মধ্যাহ্ন আকাশে।' একদিন কবিতা হয়ে উঠেছিল গান, আর আজ যেন সে মৌন ভাষায় খণ্ড খণ্ড ভাস্কর্যের নির্মাণ।

অবশ্য ভাষাও যেমন সত্যি সত্যি মৌন নয়, এ ভাস্কর্যও তেমনি নয় সুরবিহীন। এক অন্তরায়িত সংগীতকে প্রবাহিত দেখতে পাই এর আপাত সুরহারা লাইনগুলির শরীরে। শব্দে শব্দে ধ্বনিতরঙ্গ বাজিয়ে তোলার কোনো বহিঃপ্রসাধন হতে পারে কবিতায়, কিংবা হতে পারে টলটলে নদীর জলের মতো স্নিগ্ধ এক সুরও। কিন্তু এর সবটাই বাইরের, তাই সহজে ধরা যায়। কবিতার ভিতরে আছে আরেক রকম সুর, আরেক রকম গান।

রবার্ট ফ্রস্ট একবার বলেছিলেন যে কবিতা লিখবার আগের মুহূর্তে তাঁর সমস্ত শরীর যেন দ্রব হয়ে আসে, স্বর পর্যন্ত উঠে আসে এই দ্রবতা। ফ্রস্ট ব্যবহার করেছিলেন সেই শব্দটিই, fluid, যে শব্দের প্রয়োগে জাক মারিতঁ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন সৃষ্টির প্রক্রিয়া। শব্দহীন, ধ্বনিহীন একটা সুরের রণন অনুভব করেন কবি, তাঁর শ্রুতিতে নয়, তাঁর হৃদয়ে। বাণীহীন আলোড়নে সে উঠে আসে কবির স্বর পর্যন্ত, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে। সেই স্বরের উপর যখন ভর করে শব্দাবলি, কবির সত্যতম উচ্চারণ, তখন শব্দ-সংঘাতগত প্রত্যক্ষ কোনো সুর না থাকলেও কবিতা একটা সুরের আয়তন পেয়ে যায়, সেই সুর ছাড়া সেই ছন্দ ছাড়া কোনো সত্য কবিতার অস্তিত্ব নেই। 'Music is feeling then, not sound' বলেছিলেন ওয়ালেস স্টিভেন্‌স।

আপাতশিথিল এই লেখাগুলির ভিতরে জমাট হয়ে আছে সেই সুর। 'কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি, রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন' এই অনুভবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছিলেন কালিম্পঙের সেই ছোট্ট কবিতাটি: 'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে।' বলেছিলেন বটে 'জোয়ার', কিন্তু এবার এ জোয়ার এল জীর্ণ বুকের 'রক্তদোলনের মতো হাঁফধরা', কবির ব্যক্তিগত বা বিশ্বগত সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার টান। উদ্‌বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস

আমরা শুনতে পাই, কিন্তু সেও আসে দুঃসময়ের 'ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে' ছন্দের একটা হালকা আস্তরণে। এইভাবে, বিষয়ই হয়ে ওঠে রূপ, 'ফীলিং' পায় তার যোগ্য 'সাউণ্ড', সমস্তটা জড়িয়ে তৈরি হয় এক সংগতি। একদিন ছিল

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন

পদপাত পালটে দিয়ে সেকথা আজ এল এই সরলতায়: 'শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়।' এইবার, আপাত-নির্জীব ছন্দোরূপের মধ্যে, শূন্যতা আর পূর্ণতার এই প্যারাডক্সের মধ্যে, দেখা দিতে থাকে আমাদের যোগ্যতম আধুনিক ছন্দের সূচনা, যার সুর আছে ভিতরের দিকে ঘোরানো।

গদ্যকবিতায় ছন্দের অভাবকে রবীন্দ্রনাথ মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বাচনিক চাতুর্যে, অমিত্রাক্ষরে মধুসূদন যেমন একদিন ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন যমক-অনুপ্রাসের বাহার। পরের কয়েক বছর জুড়ে আবার ছন্দ এল তার জোবালো আওয়াজ নিয়ে, আর তার সঙ্গে থেকে গেল বাক্যেরও ছটা। কিন্তু এইবার, এই শেষ চতুষ্কে, এ দুই বিপরীতের সংঘর্ষ থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় একটি পথ। ছন্দ ছেড়ে গদ্য নয়, ছন্দকেই নমিত করে আনলেন কবি গদ্যের দিকে, নিয়ে এলেন তাকে অনায়াস বাক্স্পন্দে, অল্প অবসরের সীমায়। আর তখন, ভাস্করের হাতে দেখা দিতে থাকে এইসব মূর্তি:

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ।
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

শেষ বয়সে আঁকা তাঁর লাল-হলুদ-কালোতে মেলানো আলিঙ্গনমূর্তির

সেই থমথমে ছবিটি মনে পড়ে হয়তো। মৃত্যুর অল্প আগে জীবনের দিকে মরণের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাতে চেয়েছিলেন ইয়েট্‌স, Cast a cold eye/On life, on death/Horseman pass by—কোনো ক্লান্তিই রবীন্দ্রনাথের চোখে সেই শীতলতা এনে দেয়নি, এ আলিঙ্গনের রক্তিমাভা তার থেকে ভিন্ন অনেক। জীবনমৃত্যুর মিলিত তাপে আকাশের অগ্নিবাষ্প অনেকটা ঘন হয়ে ,এবার ধরা পড়ছে তাঁর ছন্দের মধ্যে। প্রায় একশোটি কবিতা নিয়ে এখানে গড়ে উঠছে তাঁর সহজ কথার লুকোনো আগুন, শীর্ণ, ঊর্ধ্বমুখিতায় স্তব্ধ। সমস্তটাকে এক করে নিয়ে স্পর্শ করা যায় এর অন্তর্গত সেই আবেগ, আবার ভিন্ন ভিন্ন করে নিলেও কবিতাগুলির সেই একই দাহ থেকে যায় পটভূমিতে। যেমন এক 'জাদুময় ঐক্য' আছে এই অগ্নিশিখার, যেমন অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন আপলিনেয়র, 'যদি একে ছিন্ন ছিন্ন করে দাও, এর প্রতিটি টুকরোই তবু হয়ে থাকে স্বতন্ত্র এক শিখা।'